বয় vs গার্ল

মূল : নাঈমা বি রবার্ট

ভাষান্তর : সাইফা জুঁই

বয় vs গার্ল
নাঈমা বি রবার্ট
ভাষান্তর: সাইফা জুঁই

মহীয়সী পাবলিকেশন্স
১৪/এ, তৃতীয় তলা, প্রিমিয়ার প্লাজা, প্রগতি সরণি, উত্তর বাড্ডা, ঢাকা-১২১২
ফোন: ০১৭৯৯৩১৩০৭৮, ০১৭৯৯৩১৩০৭৯
ই- মেইল: mohioshipub@outlook.com
ওয়েবসাইট: www.mohioshi.com

প্রচ্ছদ: ইবরাহিম নাজ
অঙ্গসজ্জা: জসিম উদ্দিন বিজয়
মুদ্রাক্ষরিক: শারমিন আকতার

বইমেলা পরিবেশক
পরিলেখ প্রকাশনী, ইউনিক প্যালেস (৭ম তলা) মির্জাপুর, মতিহার, রাজশাহী-৬২০৬
অঙ্কুর প্রকাশনী, ৩৮/৪, বাংলা বাজার (মান্নান মার্কেট), ঢাকা-১১০০
অনলাইন পরিবেশক
মহীয়সী বুকশপ (bookshop.mohioshi.com),
রকমারি, ওয়াফি লাইফ, বইপাঠাই, উপকূল ও মুসলিম বুকশপ
মুদ্রণ: মৌমিতা প্রিন্টিং প্রেস, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

শুভেচ্ছা মূল্য: ২৮০ টাকা মাত্র

Boy VS Girl by Na'ima B Robert, Translated by Saifa Jui,
Cover by Ibrahim Naaz, Published By Mohioshi Publications,
Price Tk.280, US $: 9 only
ISBN-978-984-91558-2-9

প্রকাশকের কথা

রিভার্টেড মুসলিম নাঈমা বি রবার্ট এর লেখা "বয় vs গার্ল" এর বাংলা সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আমরা গর্ববোধ করছি। বর্তমান বয় vs গার্লকে অনুবাদ না বলে সংস্করণ বলা বেশি সমীচীন এইজন্য যে, তরুণ অনুবাদক সাইফা জুঁই বইটির শাব্দিক তরজমা না করে বরং এর ভাবানুবাদ করে চমক লাগিয়ে দিয়েছেন। এখানেই অনুবাদকের চরম সার্থকতা।

নাঈমা বি রবার্ট হৃদয়গ্রাহী যে মেসেজটি দিয়েছন, তা হলো 'ইসলামি সংস্কৃতি আর মুসলিম সংস্কৃতির মধ্যেকার পার্থক্য।' বইটি পড়তে পড়তে পাঠকের চোখ বারবার আবেগে অশ্রুসিক্ত হবে। আবার তার হৃদয় ঈমানদীপ্ত চেতনায় জ্বলজ্বল করে উঠবে।

আমরা যারা জন্মসূত্রে ইসলামকে পেয়েছি, যারা মুসলিম সংস্কৃতির বাহক; আমরা অবলীলায় অনেক সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয় এড়িয়ে যাই। যা পরবর্তীতে আমাদের তরুণ প্রজন্মকে আলো থেকে অন্ধকারের পথে টেনে নিয়ে যায়। নাঈমা বি রবার্ট একজন রিভার্টেড মুসলিম হয়েও সেখান থেকে পুনরুদ্ধারের কৌশলগত সুন্দর পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। ক্লুজ (খালিদ) ও তার ভাই আনোয়ারের চরিত্র সৃষ্টি করে লেখক ধর্মের লেবাস পরা নামধারী মেকি ধার্মিকের চরিত্রকে স্পষ্ট করে তুলেছেন। কিভাবে এক মাতাল দাঁড়িওয়ালা মুসলিম যুবক (আনোয়ার) অপবিত্র মুখে 'আলহামদুলিল্লাহ্' বলছে, সালাম বিনিময় করছে; তা দেখে টলটলায়মান এক কিশোরের (ফারাজ) মন আন্দোলিত হয়ে উঠছে। এটাই আলোর দিকের আহ্বান। বইটি পড়ে পাঠকের মনে হবে তুমুল যুদ্ধ শেষে বিজয়ীর বেশে ফিরে এলাম আপন ঘরে।

বইটি প্রকাশের সাথে জড়িত যে সকল কলাকুশলী, শুভানুধ্যায়ী, উপদেষ্টা তাদের মূল্যবান সময় আর শ্রম দিয়ে সহযোগিতা করেছেন, তাদের প্রতি বিনীত কৃতজ্ঞতা। পাঠকের প্রতি নিবেদন, কোথাও কোন ভুল, মুদ্রণপ্রমাদ দৃষ্টিগোচর হলে আমাদেরকে জানিয়ে কৃতার্থ করবেন।

অনুবাদকের কথা

নাইমা বি রবার্টের "বয় vs গার্ল" ভিন্নদেশে, ভিন্ন সংস্কৃতিতে বেড়ে ওঠা দুই ভাইবোনের গল্প, পারিবারিক বন্ধনের গল্প এবং বন্ধুত্বের গল্প। লেখিকা তার উপন্যাসের চরিত্রগুলোর মাধ্যমে দেখিয়েছেন কীভাবে চারিদিকের চোখ ধাঁধানো প্রলোভন আর মিথ্যা জাঁকজমক বার বার আল্লাহ্‌র ভয় এবং ঈমানের কাছে পরাজিত হয়। এই বইটি নিয়ে কাজ করে আমি যতটা প্রশান্তি এবং আনন্দ পেয়েছি তার সিকি ভাগও যদি অনূদিত বইটি পড়ে পাঠক পান তাহলে আমি নিজের প্রচেষ্টাকে স্বার্থক মনে করবো।

ধন্যবাদ মেহেনাজ আপু এবং শারমিন আপুকে যাদের উৎসাহ এবং পরিশ্রম ছাড়া বইটি শেষ করা সম্ভব হতো না। ধন্যবাদ আব্বুকে যে ছোট বেলা থেকে নিরন্তর আমার যৌক্তিক ও অযৌক্তিক সব প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেছে।

সাইফা জুঁই

সূ চি প ত্র

প্রথম অধ্যায়
সদিচ্ছা

ফারহানা লম্বা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। তার খোলা চুলগুলো আপাতত কাঁধের দুইপাশে দুলছে। একটু পরেই সেগুলোকে স্কুলে যাওয়ার জন্য ঝুঁটিতে আটকে ফেলা হবে। তার চুলগুলো বেশ সোজা। কিন্তু ঠিক ফ্যাশনেবল বলা যায় না। অবশ্য একটা স্ট্রেইটনার দিয়ে সহজেই ঠিক করে ফেলা যায়। হট এশিয়ান মেয়েদের সবাই এখন তাদের চুল সোজা করে ফেলে। কোকড়ানো চুল এখন বড্ড সেকেলে হয়ে গেছে। ফারহানার ত্বক বেশ মসৃণ। কফির মত রং যাতে একটুখানি ক্রিমের ছোঁয়া আছে। দীর্ঘ, কালো পাঁপড়িতে ঢাকা সবুজ চোখের জন্য ছেলেরা তাকে প্রায়ই বলিউডের নায়িকা ঐশ্বরিয়া রাইয়ের সাথে তুলনা করে। অবশ্য ছেলেরা যা চায় তা পাওয়ার জন্য সব বলতে পারে। স্কুলের ইউনিফর্ম তার লম্বা দেহের সাথে লেপ্টে গিয়ে শরীরের ভাঁজগুলোকে আরোও স্পষ্ট ও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। ঠিক তার মা যেমনটা পছন্দ করে। ফারহানার আম্মাজি বলতেন, তার স্কুলড্রেস যথেষ্ট শালীন। একজন ভদ্র পাকিস্তানি মেয়ে দেখতে যেমন হওয়া উচিত। কিন্তু কোমরের বেল্ট ঠিক করতে করতে ফারহানার চোখ বারবার উপরের দিকে চলে যাচ্ছে। যেখানে আয়নার কোণে সাদা এক টুকরো কাপড় রাখা আছে। সে তার মাথার ভিতরে নাজমা ফুফু কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে। "হিজাব সুরক্ষার জন্য, নিপীড়নের জন্য নয়। তোমার শরীর, তোমার সৌন্দর্য যা কিছু তোমাকে আশীর্বাদ হিসাবে দেওয়া হয়েছে এগুলো তোমার একান্তই নিজস্ব সম্পদ। মানুষকে প্রদর্শনের জন্য নয়। তোমার মূল্য এর চাইতেও অনেক, অনেক বেশি।" ফারহানা রুদ্ধশ্বাসে হিজাবের দিকে হাত বাড়ালো। সে কল্পনায় দেখতে থাকলো 'নিজের হাতে সে হিজাব পরিপাটি করে ভাঁজ করছে। মাথার উপর রেখে থুতনির নিচে পিন দিয়ে আটকাচ্ছে। হিজাবের দুই পাশ দিয়ে ঢেকে দিচ্ছে তার দুই কাঁধ। ফারহানা হিজাব পরবে! এতটা সাহস কি তার হবে কখনো?' কিন্তু তখনই তার মায়ের কথাগুলো

মনে পড়লো। "শালীন পোশাক পরাই যথেষ্ট। কিছু মানুষ অনেক বাড়াবাড়ি করে। তোমার নাজমা ফুফুকেই দেখো! তোমার এইসব ফালতু হিজাব, জিলবাব ও নেকাবের কোন দরকার নেই। প্রথমত এটা আমাদের সংস্কৃতির অংশই না। আর আমরা যেহেতু এখন এখানে বাস করছি, আমাদের উচিৎ এখানকার পরিবেশের সাথে তাল মিলিয়ে চলা। এইসব পরলে অন্যরা মনে করবে, মুসলিম নারীদের দমিয়ে রাখা হয়েছে। তাদের উপর জুলুম করা হচ্ছে। তোমার মধ্যে বিশ্বাস থাকলেই হবে।"

সে নিজেও স্পষ্টভাবে দেখেছে সাজিয়া, রবিনার চোখে মুখে আতঙ্ক। স্কুলের বাকি মেয়েদের অদ্ভুতভাবে তাকানো। দোকানের লোকগুলোর বাঁকা হাসি।

আর মালিক, সেই বা কী বলবে?

ফারহানা মাথা নাড়ালো। অবশ্য তার সাহস নেই। এখন না, অন্তত আজ না।

"ফারহানা! ফারাজ!" তার মা নিচ থেকে ডাকছেন। তাড়াতাড়ি করো। তোমাদের দেরি হয়ে যাবে!"

ফারহানা টেবিলের বইগুলো কোনমতে ব্যাগে ঢুকালো। এগুলো সে পরে গুছিয়ে নেবে। "আসছি আম্মাজি!" বলে সে নিচে নেমে গেলো।

বারান্দার অন্য পাশের রুমে একই সময়ে ফারহানার জমজ ভাই ফারাজও স্কুলের জন্য তৈরি হচ্ছিলো। বোনের চাইতে ছয় মিনিট পরে জন্মানোর জন্যই যেন অন্য সব কাজও সে বোনের পরেই শেষ করে। সে এখনো তার স্কুলের শার্ট না পরে আয়নার সামনে শুধু গেঞ্জি আর প্যান্ট পরে দাঁড়িয়ে আছে। অন্যদিনের মতই নিয়ম মাফিক পারফিউম দেওয়ার পর জেল দিয়ে চুল স্পাইক করা হয়ে গেছে। থুতনির নিচে হালকা দাঁড়ির আভাসের কথা ভেবে সে নিজের মনেই হাসলো। সে এখনই পুরুষ মানুষ হয়ে গেছে। ফারাজ ঘুরে দাঁড়িয়ে নিজের হাত দেখলো। বেশ মসৃণ, বাদামি ও বলিষ্ঠ।

গত বছর সে বেশ খানিকটা সময় জীমে কাটিয়েছে। সেগুলো মনে হয় কাজে দিচ্ছে। সে আর রোগা নেই।
তার সুঁচগুলোর কথা মনে পড়ে গেলো। সেই নীল রং। এই হাতেই হয়তো বা সেই নকশা (ট্যাটু) আঁকা হবে। ফারাজ নিজের মনেই কেঁপে উঠলো। সে কি পারবে এই সব কিছু করতে?
ছোটবেলা থেকে মাদরাসায়, মসজিদে বড়দের মুখে যে কথাগুলো সে শুনে এসেছে সব একসাথে মনে পড়ে গেলো। উল্কি আঁকা হারাম। ইসলামে নিষিদ্ধ। "আল্লাহর সৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন আনা যাবে না....।" এই কথাই বলেছিলেন নাজমা ফুফু। ফারাজ নিজের অজান্তেই নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরলো। কিন্তু তার স্ক্রুজের কণ্ঠস্বর মনে পড়লো। মধুর মত কোমল, চাকুর মত ধারালো। "আমাদের সবার ট্যাটু আছে ফারাজ! এই প্রতীকের আলাদা শক্তি আছে বন্ধু। কিন্তু তুমি তো জানো কেউ চাইলেই এটা পায় না। এটা অর্জন করে নিতে হয়। আর তুমি" স্ক্রুজ ফারাজের দিকে ইশারা করে মাথা নাড়িয়ে বলেছিলো, "তুমি ভালোই কাজ করছো বন্ধু। শুধু আমার জন্য ছোট খাটো আর কয়টা খুচরো কাজ করে দিতে হবে। তারপর তুমিও এই ব্যাজ পরতে পারবে।" তার বুক ফুলে উঠলো। ইদানিং সবাই তার দিকে যে সম্মানের চোখে তাকায় তাতে সে ভালোই মজা পাচ্ছে। হয়তো এর জন্য ট্যাটু করাই যায়? শুধু এই একটা...। সে তার মায়ের ডাক শুনতে পেলো। "আমি আসছি আম্মাজি। আমি আসছি" ফারাজ জবাব দিলো। সে তাড়াতাড়ি গত রাতের ইস্ত্রি করে ঝুলিয়ে রাখা শার্ট গায়ে দেয়া শুরু করলো। পরিষ্কার শার্টই তার মাকে শান্ত করার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু ফারাজকে দিয়ে তার মা টাই পরাতে পারবেন না। শুধুমাত্র লুজাররাই টাই পরে স্কুলে যায়।
আবার নিচ থেকে ডাক শোনা যাচ্ছে। ফারাজ নিচে নেমে গেলো।
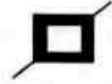
জমজ দুই ভাই-বোনের বাবা মাহমুদ সকালের পত্রিকা থেকে মুখ না তুলেই বললেন "আমি গত রাতে ইমাম শাকিরের সাথে কথা বলেছি।" স্বামীর

কথা শেষ হতে না হতেই ফারহানা ও ফারাজের মা উজমা স্বামীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, "উনি কী বলেছেন? রমজান কবে শুরু হবে?"
উজমা কেতলির পানি উতলানোর জন্য অপেক্ষা করছিলেন ফারহানা ও ফারাজের মা উজমা স্বামীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন। একই সাথে প্লেটে খাবারও বাড়ছিলেন ও টোস্টারের দিকেও নজর রাখছিলেন।
"উনি বলেছেন সামনের সোমবার" মাহমুদ চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন। এরপর তিনি আবার বললেন, "কিন্তু কোনরকম ঘোষণা দেওয়ার আগে তাদের পাকিস্তান থেকে আসা খবরের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।"
ফারাজ আইপড চালু করতে করতে বললো "আপু চা দাও"
"এক্ষুণি দিচ্ছি। অলস কোথাকার!" ফারহানা ফাজলামো করে চোখ রাঙিয়ে বললো, "এই ছেলে সব সময় কেন দেরি করিয়ে দেয়!"
ছেলে-মেয়েদের দিকে তাকিয়েই উজমার চোখ ভালোবাসায় ভরে উঠলো। ফারহানা আর ফারাজ তাদের বিয়ের ছয় বছর পরে হয়েছে। এরপরে তাদের আর কোন বাচ্চা হয়নি। অনেক বছর আগে যখন তিনি করাচী থেকে নতুন বউ হয়ে এসেছিলেন, তখন কি ভেবেছিলেন ওনার জীবন এমন হবে।
আলহামদুলিল্লাহ্! তার বাবা-মা স্বামী হিসাবে মাহমুদের মত একজন ভালো মানুষকে পছন্দ করেছেন। উজমা তার স্বামীর মধ্যে আজ পর্যন্ত কোন দোষ খুঁজে পাননি। তিনি তার জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট। তার দুই ছেলেমেয়েই শান্ত-শিষ্ট ও ভদ্র। তাকে কখনো অন্যদের মত বাচ্চাদের নিয়ে চিন্তায় থাকতে হয়নি। এমনকি পাকিস্তানেও কেউ মিডিয়ার খারাপ প্রভাব থেকে মুক্ত না।
কয়েক বছর আগের রায়টের কথা ভাবলেই তিনি কেঁপে ওঠেন। এখনো স্পষ্ট মনে আছে কীভাবে কয়েকজন যুবক মিলে তাদের ছোট্ট সংবাদপত্রের দোকানটা লুটপাট করেছিলো। তিনি বারবার আল্লাহকে ধন্যবাদ দিয়েছেন, ভাগ্যিস ফারাজ রায়টে যোগ দেওয়ার মত বড় ছিলো না। ফারাজ তখনো চশমা পরা জবুথবু ছোট্ট এক বালক। তিনি কখনো ভাবতেও পারেন না, তার ছেলে এমন কিছুতে যোগ দেবে। তার ছোট্ট

ফারাজ। যে ছোট বেলা থেকেই নরম স্বভাবের। যে কোন কারণ ছাড়াই হঠাৎ করে জড়িয়ে ধরতো। কুরআনের সুন্দর তেলাওয়াত শুনলেই ভিজে উঠতো যার চোখ।

ফারহানা ছিলো তার উল্টো। কঠিন স্বভাবের। সব কিছুর পেছনেই যে যুক্তি খুঁজতো। ব্যাখ্যা জানতে চাইতো। উজমা জানতেন দুইজনের বিপরীত হওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু সন্তানের স্বভাবতো তিনি চাইলেই অস্বীকার করতে পারেন না। যুবক বয়সে মাহমুদ যেমন তাগড়া জোয়ান ছিলেন, তার ছেলে তেমন হবে না। আর এটা তিনি মেনেও নিয়েছেন। উজমা স্বামীকে আরেক কাপ চা দিতে দিতে চিন্তা ভাবনা রমজানের দিকে ঘুরিয়ে নিলেন।

"আসলে ফারহানা এটা অনেক কিছুর ওপর নির্ভর করছে" মাহমুদ বলছিলেন, "মসজিদ চাইবে পাকিস্তানের সময় অনুযায়ী চলতে। তারা সব সময় যেমনটা চায়। তাই তারা যা ঠিক করবে, আমাদেরকেও সেটাই করতে হবে।"

রমজান নিয়ে এই বিতর্ক ফারহানার কাছে সব সময়ই অদ্ভুত লাগে। চাঁদ দেখা গেছে কি যায়নি। কে দেখেছে। কোন দেশে দেখা গেছে। এমনিতে দেখতে গেলে পুরো ব্যাপারটা সহজ। যদি নতুন চাঁদ দেখা যায়, তাহলে নতুন চন্দ্রমাস শুরু হবে। সেই সাথে মানুষ রোজা রাখা শুরু করবে। অবশ্য মানুষের তর্ক-বিতর্ক এতে থামে না।

ফারহানা চিন্তা করতে করতে তার টোস্টে কামড় বসালো। আর কিছুদিন পরেই তারা আর এই সময়ে খাওয়া দাওয়া করতে পারবে না। রান্নাঘর পরিচ্ছন্ন আর ফাঁকা থাকবে। টেবিলের উপর কোন কাপ প্লেট থাকবে না। কড়াই থেকে ফোড়নের কোন শব্দও আসবে না। সাহ্‌রীর পর সব কিছু পরিষ্কার করে ফেলা হবে। সাধারণত সূর্য ওঠার আগে যখন চারিদিকে অন্ধকার থাকে, তখন সাহ্‌রীর খাবার খাওয়া হয়। সূর্যাস্ত ও ইফতারের সময় তারা যখন তাদের রোজা ভাঙবে, এই রান্নাঘরে তখন আবার প্রাণ ফিরে আসবে। ফারহানা মনে মনে হাসলো। সে এবারের রোজার জন্য অপেক্ষা করছে। তার ভেতর থেকে কেউ যেন বলছে, এই বছর অন্য সব

বছরের চাইতে আলাদা হবে। আমি এইবার নিজেকে বদলাবো। সে নিজের মনেই ভাবলো।

ফারাজও রমজানের কথাই ভাবছিলো। সে গত বছর রোজা রাখার চেষ্টা করেছে। কিন্তু চারিদিকে এত কিছু ঘটছিলো। এত ঝামেলা ছিলো যে, সে মাসের মাঝখানেই রোজা রাখা ছেড়ে দিয়েছিলো। যদিও তার বাবা মা এ ব্যাপারে কিছুই জানে না। তাদের আড়ালে টাউন সেন্টার থেকে সারাদিনে কিছু খেয়ে নেয়া কোন ব্যাপার ছিলো না। যেহেতু ওখানে খুব বেশি এশিয়ান থাকে না, তাই দোকানগুলো সারাদিন খোলাই থাকে।

কিন্তু এই বছর সে ঠিক করে রেখেছে, সব রোজা রাখবে। তার বয়স ষোল হয়ে গেছে। সে বড় মানুষ হয়ে গেছে। আর এটা প্রমাণ করার জন্য টিকালো থুতনির দরকার নেই। অন্তত ধর্মীয় বিশ্বাস তা বলে না। সব ঠিক করার সময় এসে গেছে এবার।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অনুপ্রেরণা

শনিবার কারো নিশ্বাস নেয়ার সময় ছিলো না। এমনকি জমজ দুই ভাই-বোনও অন্য দিনের মত দেরি করে ওঠার সুযোগ পায়নি। আম্মাজি সাড়ে নয়টার আগেই জানালার পর্দা খুলে ভাই-বোনের ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে গেছেন।

"তোমরা দুইজন এক্ষণি ঘুম থেকে ওঠো" আম্মাজি তাড়া দিয়ে বললেন। "রমজান আসছে। আমাদের অনেক কিছু করতে হবে!"

প্রথমেই পুরো বাড়ির চেহারা ঠিক করতে হবে। ঝুল ঝাড়তে হবে। মেঝে মুছতে হবে। তোষকগুলো রোদে দিতে হবে। সব কাপড় পরিষ্কার করতে হবে। এগুলো সব ফারহানা ও তার আম্মাজির কাজ। আর ফারাজ ও তার বাবার কাজ হল, বাজার করে আনা। আম্মাজি তাদের বাবা আর ফারাজকে লম্বা একটা লিস্ট দিয়ে বাজারে পাঠালেন। আর বাজার করা শেষে সোজা বাসায় ফিরে আসতে কড়াভাবে বলে দিলেন ।

কয়েক ঘন্টা পরেই ঘষেমেজে পরিষ্কার করা রান্নাঘরের তাকগুলো ঝকঝক করছিলো। আর তাতে নতুন বিশাল ঘি এর টিন, ডাল, আটা, চিনি, মধু, মদিনা থেকে আসা খেজুর, তাদের প্রতিবেশির মক্কা থেকে আনা জমজমের পানির বোতল, ফলের রস এবং নতুন হলুদ, মরিচ, জিরা ও ধনিয়ার প্যাকেট রাখা হল। তার সাথে রইলো আম্মাজির নিজের হাতে বানানো আচার ও গরম মশলার প্যাকেট।

ফারহানার বাবা আর ভাই বিশাল এক বাজারের ব্যাগ ধরে নিয়ে আসছিলো। ফারহানা ভাবতে লাগলো, কি অদ্ভুত! রমজান সংযমের মা। আমাদের না খেয়ে থাকার কথা। কিন্তু আমরা অন্য সময়ের চাইতে এখন খাবার নিয়ে বেশি চিন্তা করি।

সেদিন বিকেলে আম্মাজি আর বাবা ফারহানার দাদীজির বাড়ি বাজার করে দিতে গেলেন। দাদীজিকে বৃষ্টির মধ্যে কষ্ট করে যাতে বাজারে যেতে না

হয়। সেদিন এই সময় তাদের বাবার ছোট বোন নাজমা ফুফু বাড়িতে আসলেন।
ফারাজ তার রুম থেকে কলিংবেলের শব্দ শুনে এসে দরজা খুলে দিলো। দরজার সামনে নাজমা ফুফু দাঁড়িয়ে ছিলেন। বৃষ্টির মাঝখানে কালো একটা ছায়া। ছাতা তার মাথাকে ভেজা থেকে বাঁচাচ্ছিলো। কিন্তু তার জিলবাব ও লম্বা কালো চাদর বাগানের বৃষ্টির পানিতে ভিজে জবজবে হয়ে গেছে। তার মুখ নেকাব দিয়ে ঢাকা। আর হাত কালো মোজায় আচ্ছাদিত।
রাস্তায় নাজমা ফুফুকে দেখে কেউই ধারণাও করতে পারবে না যে, তিনি হালকা নীল জিন্সের সাথে কোর্তা পরতে পছন্দ করেন। কিংবা তার নাকে ছোট্ট একটা হীরার নাকফুল আছে। আর তিনি স্যান্ডউইচ ও ডিজাইনের ব্যাগ অসম্ভব রকম পছন্দ করেন। বাসে কিংবা দোকানে তার সাথে দুই একটা কথা বলে বোঝাই যাবে না, তিনি ফার্স্ট ক্লাস ডিগ্রিধারী। বিদেশি সাহিত্য ও কলার প্রতি তার রয়েছে অগাধ ভালোবাসা। রাস্তার লোকের কাছে তিনি অন্য সব পর্দা করা সাধারণ মহিলার মতই। তাদের এলাকায় পর্দায় আচ্ছাদিত নাজমা ফুফু একটি পরিচিত দৃশ্য। কিন্তু শহরতলি আর টাউন সেন্টারে সেটা একেবারে অবাঞ্ছিত। অনেকের কাছে তা একেবারেই খাপছাড়া মনে হয়। ফারাজ আর ফারহানা অনেক আগেই থেকেই তাদের ফুফুকে এমন অবাঞ্ছিত পোশাকে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। যদিও তাদের পুরো পরিবারই লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিরে আসা মেয়ের পরিবর্তন দেখে প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছিলো। নাজমা ফুফু এক সময় লাগামহীন ছিলেন। কিন্তু সেই তিনিই লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পুরোপুরি ইসলামী চিন্তাধারার মানুষ হয়ে ফেরত এসেছিলেন। পরিবর্তনটা একেবারে চোখে পড়ার মত ছিলো।
আম্মাজি প্রায়ই বলতেন,"বাড়াবাড়ি করা লোক আমার অসহ্য লাগে।" বাড়াবাড়ি করুন বা না করুন নাজমা ফুফু যমজ ভাইবোনের কাছে আত্মীয়দের মধ্যে সবচাইতে বেশি পছন্দের ছিলো। তাদের কাছে তিনি সব সময় আসতে পারতেন।

"ফারাজ" নাজমা ফুফু মিষ্টি করে বললেন, "আসসালামু আলাইকুম! তুমি কোথায় থাকো বলো তো? আমি তো ভেবেছিলাম তুমি গত সপ্তাহে আমাকে দেখতে যাবে।" তার কণ্ঠস্বর সন্দেহাতীত কোমল।

"ওয়ালাইকুম আসসালাম ফুফু" ফারাজ হাসিমুখে জবাব দিলো। সে দরজা খুলে দিয়ে সরে দাড়িয়ে বললো, "বাবা আমাকে দোকানে সাহায্য করতে বলেছিলেন।"

ঘরের ভিতরে ঢুকে নাজমা ফুফু নেকাব খুলে ফেললেন। হাতের মোজা খুলতে খুলতে হাসিমুখে ফারাজকে জিজ্ঞাসা করলেন "তুমি কেমন আছো বাবা?"

"ভালো ফুফু। আমি ভালো আছি। আপনি?"

"আলহামদুলিল্লাহ্ খুবই ভালো।"

"নাজমা ফুফু!" ফারহানা উপর থেকে তার ফুফুর কণ্ঠস্বর শুনে দৌড়ে নিচে এসে ফুফুকে জড়িয়ে ধরলো। নাজমা হেসে ফেললেন। "ঠিক আছে, ঠিক আছে। আস্তে!" তারপর তিনি ফারাজের দিকে ফিরে বললেন, "তোমরা দুইজন কি কয়েক ঘণ্টার জন্য ফ্রি আছো? আমাদের রমজানের কিছু প্রস্তুতিতে তোমাদের সাহায্য লাগতো।" জমজরা একজন আরেকজনের দিকে তাকালো।

"হয়তো বা" ফারহানা বললো। "আম্মাজি আর বাবা দাদীজীর বাসায় বাজার নিয়ে গেছেন।"

"ঠিক আছে ওনাদের কাছে ফোন দিয়ে জিজ্ঞাসা করে অনুমতি নাও। হয়তো বা বাসায় তোমাদের অন্য কাজ থাকতে পারে। আমি জানি রমজানের আগে কি পরিমাণ কাজ থাকে!"

ফারহানা দৌড়ে তার মাকে ফোন দিতে গেলো।

ফারাজ জুতা পরতে পরতে জ্যাকেট খুঁজতে লাগলো। "ফারাজ" নাজমা ফুফু বললেন, "তোমার কি এমন কোন জ্যাকেট আছে যেটা তুমি আর পরো না?"

"উমমম, মনে হয় না।"

"ওখানে যেটা পড়ে আছে সেটা?" নাজমা ফুফু হুকের সাথে ঝুলানো একটা জ্যাকেট দেখালেন। "আমি গত বছরের পর থেকে তোমাকে এটা আর পরতে দেখিনি। আমার মনে হয় এটা আর তোমার গায়ে লাগে না!"
ফারাজ লজ্জা পেয়ে হাসলো। গত বছরের চাইতে সে এখন অনেক লম্বা। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে অব্যবহৃত অনেকগুলো কোট, জ্যাকেট খুঁজে বের করলো।
"আপনার এগুলো কি কাজে লাগবে ফুফু?" সে এগুলো একটা বড় শপিং ব্যাগে ভরতে ভরতে বললো।
"শীত চলে আসছে। আর এমন অনেক মানুষ আছে, যারা ফারাজ আহমেদের ফেলে দেওয়া কাপড় পেলে ধন্য হয়ে যাবে।"
তারা বাড়ি থেকে তিন ব্যাগ ভর্তি গরম জামা কাপড় আর জুতা নিয়ে বের হলো। নাজমা ফুফু সবকিছু তার ছোট্ট গাড়ির ট্রাংকে ভরে নিলেন।
ফারহানা মনে মনে হাসলো আর ভাবলো, মাথা থেকে পা পর্যন্ত কালো কাপড় দিয়ে ঢাকা একজন মহিলা লাল রঙের মিনি কুপার চালাচ্ছেন। প্রতিবেশীরা এই দৃশ্য দেখে ঠিক কী ভাবেন?
নাজমা শনিবারে বৃষ্টি ভেজা রাস্তায় ধীরে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে। যাওয়ার পথে তারা তিনজন অনেক গল্প করলো। মনে হচ্ছিলো যেন করাচীর কোন এক পল্লী গ্রামের বাতাসের ঘ্রাণ গাড়ির জানালার পাশ ঘেঁষে এই প্রবাসীদের পিছু নিয়েছে। যাদের পূর্বপুরুষেরা পঞ্চাশের দশকে এসে ইট পাথরের বাড়ি আর ইংরেজ আবহাওয়ায় সব ভুলে গেছে। আর এখানেই স্থায়ীভাবে থেকে গেছে।
ভেজা রাস্তা ক্রেতায় ভর্তি ছিলো। যারা সামনের সপ্তাহগুলোর জন্য বাজার করতে বের হয়েছেন। দাঁড়ি, টুপি, হিজাব, ওড়না, বোরকা, সালোয়ার ও কামিজ সব একসাথে মিলেমিশে রাস্তার পাশে অদ্ভুত সুন্দর এক দৃশ্য তৈরি করেছে। জানালার পাশে নানা রকমের শাড়ি আর সালোয়ার-কামিয সাজিয়ে রাখা। যেন ট্র্যাডিশনাল স্টাইল আর নতুন ডিজাইনের কাপড়ের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছে। জুয়েলারি দোকানগুলোতে অসম্ভব উজ্জ্বল গহনা জ্বলজ্বল করছে। পাশের দোকানে নকল ডিজাইনের জুতা আর ব্যাগ

আছে। সবজির দোকানগুলোতে দক্ষিণ এশিয়ার নানা রকমের সবজি যেমন মূলা, করলা, লাল মরিচ ও ঢেঁড়স ইত্যাদি উপচে পড়ছে । আর ফলের দোকানে খেজুর, পাকা আম, নারিকেল ও সফেদাসহ বিভিন্ন ধরণের ফলের এক কেজি করে ওজনের বক্স করা হয়েছে। আর পাশের অন্ধকার দোকানগুলো থেকে ঝাঁঝালো নানা রকম গন্ধ এসে নাকে লাগছে। অন্ধকার দোকানগুলোতে বড় বড় বস্তায় করে চাল, ডাল ও গম রয়েছে। আর গামলা ভর্তি রয়েছে ধনিয়ার গুড়া, হলুদের গুড়া, জিরা আর এলাচ দানা। হালাল কসাই খানার সামনে মানুষ লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একের পর এক ডেলিভারি ভ্যান আসছে। আর এখানকার প্রায় সবাই এশিয়ান। মাঝে মাঝে হয়তো সাদা চামড়ার কাউকে দেখা যায়। তারা কুকুর নিয়ে হাঁটতে বের হয়েছে। অথবা কোন ট্রলি ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। তবে এই ধরণের দৃশ্য সচারাচর দেখা যায় না।

কিন্তু নাজমা আন্টি থামলেন না। তিনি গাড়ি চালিয়েই যাচ্ছেন। তারা নিজেদের এলাকা ছাড়িয়ে অন্য এলাকায় ঢুকে পড়লো।

অবশেষে জমজরা প্রশ্ন করলো,"আমরা কোথায় যাচ্ছি ফুফু?"

"আমি সপ্তাহে দুইদিনের জন্য গৃহহীন নারীদের আশ্রমে ভলান্টিয়ার হয়েছি। আমি একজনকে কথা দিয়েছি, আজ সেখানে যাবো" নাজমা ফুফু বললেন।

জমজরা একে অন্যের দিকে তাকালো। আশ্রম? নাজমা ফুফু তাদের দৃষ্টি বিনিময় দেখে হাসলেন।

"চিন্তা করো না। আমি তোমাদের নোংরা কাপড় আর রান্নাঘর পরিষ্কার করাতে নিয়ে যাচ্ছি না। আমি ওখানে বেশিক্ষণ থাকবোও না। তোমাদের গাড়ির বাইরেও আসতে হবে না। অবশ্য তোমরা চাইলে সাথে আসতে পারো। আর কে জানে এটাতে হয়তো তোমাদের উপকারও হতে পারে...।"

গাড়ি পার্ক করার পর নাজমা জমজদের তাকে ব্যাগ নিতে সাহায্য করতে বললেন। এটা মহিলাদের আশ্রম হওয়ায় ফারাজকে ব্যাগগুলো দরজা পর্যন্ত

এগিয়ে দিয়ে বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলো। নাজমা দরজার পাশে রাখা একটা এন্ট্রি খাতায় স্বাক্ষর করে ভিতরে ঢুকলেন।

ফারহানা সাবধানে চারপাশে দৃষ্টি বুলালো। সে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থাকতে চাইছিলো না। কিন্তু এই জায়গা আর এখানকার বাসিন্দাদের ব্যাপারে তার কৌতুহল বেড়েই যাচ্ছিলো। কিছু মহিলা যেন তার দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আবার অনেকের তাকে নিয়ে কোন আগ্রহই নেই।

নাজমা ফুফু একজন অল্প বয়স্ক মহিলার দিকে নেকাব দেয়া অবস্থায়ই এগিয়ে গেলেন। তার গায়ে অনেক জায়গায় ফুটানো ছিলো। নাজমা বা অন্য কেউ তা গুনে শেষ করতে পারবে না। ফারহানা দেখতে পেলো মহিলার ন্যাড়া করা মাথায় একটা বিশাল ট্যাটু। ন্যাড়া মাথায় অল্প অল্প চুল গজাচ্ছে। ফারহানা অজান্তেই কেঁপে উঠলো। তিনি চলে যাচ্ছিলেন। ঠিক তখনই নাজমা ফুফু হেসে তাকে ডাক দিলেন।

"অ্যালিস" নাজমা ফুফু বললেন, "আমার ভাতিজীর সাথে পরিচিত হও।" তারপর ফারহানার উদ্দেশ্যে বললেন, "ফারহানা ইনি অ্যালিস।"

ফারহানা হেসে স্বাভাবিকভাবে বলার চেষ্টা করলো "হাই।"

"হাই" অ্যালিস তার সুন্দর কোমল স্বরে বললেন। যেটা তার বাইরের রূপের সাথে একেবারেই মেলে না। অ্যালিস মোলায়েম স্বরে আবার বললেন, "তাহলে তুমিই সেই বিশেষ ভাতিজী; যার কথা আমি এত শুনেছি!"

ফারহানা অবাক হয়ে তার ফুফুর দিকে তাকালো। তিনি হাসলেন আর বললেন, "তুমি তো জানোই, আমি সব সময় সবার কাছে আমার মেধাবী, সুন্দরী ভাতিজীর গল্প করি। মাশা আল্লাহ্।"

ফারহানা লজ্জা পেয়ে হাসলো। অবশেষে সে বললো, "আপনার সাথে দেখা হয়ে ভালো লাগলো"। সে বুঝতে পারছিলো না তার আর কি বলা উচিত। অথচ দেখে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল, নাজমা ফুফু আর অ্যালিসের কথা বলার জিনিসের অভাব ছিলো না। তারা টানা বিশ মিনিট কথা

বললেন। আর একটু পর পর হেসে উঠছিলেন। এরপর নাজমা ফুফু কিছু কাগজ বের করে অ্যালিসকে দিলেন।

"তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ নাজমা!" ফারহানা অ্যালিসকে বলতে শুনলেন, "আমি জানি না তুমি না থাকলে কী হতো"।

"আরে এটা কিছুই না" নাজমা ফুফু জবাবে বললেন, "ন্যায়বিচার হবেই ইনশাআল্লাহ্।"

অ্যালিস হাসলেন। তার সামনের পাটিতে মাঝখানের দুইটা দাঁত ছিলো না। "হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ্।"

তারা দুইজনে একে অপরকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর নাজমা ফুফু ফারহানার কাছে ফিরে আসলেন।

"উনি কি মুসলিম"? ফারহানা জানতে চাইলো।

"না" নাজমা হাসলেন, "সে আমার কাছ থেকে শুনে ইনশাআল্লাহ্ বলেছে। কিন্তু কে জানে কখন কী হয় বলো...।"

একটু পরেই তারা একটা রেস্টুরেন্টে লাল চামড়া দিয়ে মোড়ানো বেঞ্চে বসে মিল্কশেকের মেন্যু দেখছিলো।

"হুমম" নাজমা ফুফু নিজের মনেই বললেন, "আমি এখনো সব ফ্লেভার ট্রাই করিনি। কিন্তু আমি ব্যানানা পিনাট বাটার নিচ্ছি আর তোমরা?"

জমজরা মেন্যুতে এত অপশন দেখে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলো।

"ধীরে সুস্থেই অর্ডার দাও। কোন সমস্যা নেই" তিনি ব্যাগ থেকে মরক্কোর চামড়ার কাভারের একটা নোটবুক বের করলেন।

"এটা কী নাজমা ফুফু?" ফারহানা উঁকি দিয়ে জিজ্ঞাসা করলো।

"এটা আমার ডায়েরি" তাদের ফুফু পৃষ্ঠা উল্টাতে উল্টাতে জবাব দিলেন। "কিছুদিন পরেই রমজান শুরু হবে তাই না? আমি এইজন্য রমজানের প্রস্তুতি হিসাবে ডায়েরি রাখছি। যাতে আমি রমজানে কী কী করবো, কোন কোন জিনিস সংশোধন করবো তার একটা তালিকা রাখতে পারি।"

ফারহানার ভ্রূ কুঁচকে গেলো। নাজমা ফুফুরও সংশোধন করার মত কিছু থাকতে পারে? কী সেটা?"

"উমম" নাজমা ডায়েরির খোলা পৃষ্ঠার উপর চোখ বুলিয়ে বললেন, "যেমন ধরো কুরআন খতম দেয়া। তাহাজ্জুদ পড়া। মানুষকে কাপড় দান করা। আমার প্রিয় ভাতিজা ও ভাতিজীকে নতুন রেস্টুরেন্টে ইফতার করতে নিয়ে যাওয়া...। এই ধরনের কাজ" তিনি তাদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। "আর তোমরা কীভাবে রমজানের প্রস্তুতি নিচ্ছো?"
ফারাজ আর ফারহানা হতবুদ্ধি হয়ে একে অন্যের দিকে তাকালো।
"আপনি কী জানতে চান ফুফু?" ফারাজ জিজ্ঞাসা করলো। "কী প্রস্তুতি? যদি আপনি না খেয়ে থাকার কথা বলেন তাহলে আমি প্রস্তুত।"
"তুমি বলতে চাচ্ছো গতবছরের মত নয়? ফারহানা গতবছর তার ভাইয়ের রোজা নিয়ে নাটক ফাঁস করে দেওয়ার লোভ সামলাতে পারলো না।
ফারাজ চোখ রাঙালো। "হ্যাঁ গতবারের মত না! আর তুমি আমার মুখ খুলিও না! আমি জানি তুমি আর সাজিয়া চিপ শপে কী করেছিলে!"
ফারহানা লাল হয়ে গেলো। "ওটা আলাদা!" সে প্রতিবাদ করে উঠলো। "সাজিয়া তখন রোজা রাখছিলো না, আর আমি...।"
ফারাজ হাসিতে ফেটে পড়লো। "তোমার ওযুহাত বিচারকের জন্য তুলে রাখো বুঝলে! মেনে নাও যে তুমিও আমার মতই ফাঁকিবাজ!"
ফারহানা খিলখিল করে হেসে ফেললো।
"আচ্ছা, কিন্তু ওসব কিছুই তোমরা এই বছর করবে না। ঠিক আছে?" তাদের ফুফু কড়াভাবে বললেন। শুধু তার ঠোঁটের কোণায় একটুখানি হাসি ছিলো।
তারপর ওয়েটার তাদের অর্ডার নিতে আসলো। ফারহানা ভাবলো তার নতুন কিছু ট্রাই করা উচিৎ। তাই সে ব্লাকবেরি চিজ কেক নিলো। আর ফারাজ সবসময়ের মত স্ট্রবেরি ভ্যানিলা শেক নিলো।
"ঐ স্ট্রবেরি প্রোটিন শেকগুলো সারাজীবনের জন্য তোমার মুখের স্বাদ নষ্ট করে দিয়েছে।" ফারহানা ফাজলামি করে বললো।
জমজরা হাসলো। অনেকদিন হয়ে গেছে তারা এভাবে এক সাথে হয় না। শুধু তারা দুইজন আর নাজমা ফুফু।

"ঠিক আছে চলো অন্যভাবে চিন্তা করি।" নাজমা ফুফু বললেন। "আমি চাই তোমরা আমাকে রমজান সম্পর্কে বলো। কেন এত আয়োজন? আমরা এইগুলো কেন করি?"

জমজরা নিজেদের দিকে তাকিয়ে চোখ উল্টালো। তারা কি মাদরাসায় চলে এসেছে নাকি? তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে তারা রমজান সম্পর্কে যা জানতো বলতে লাগলো। নাজাতের মাস। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কিছু খাওয়া বা পান করা যাবে না। এটা ইসলামের একটা স্তম্ভ। এই মাসে শয়তানকে আটকে রাখা হয়। ভালো কাজ করার সময়। যারা সারা মাস সাওম পালন করবে তাদের সব গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

"ঠিক আছে ভালো। তোমরা মোটামুটি প্রাথমিক সব কিছু জানো" নাজমা ফুফু বললেন। "তোমরা নিশ্চয়ই এটা নিয়ে সন্তুষ্ট। কিন্তু আমি জানতে চাচ্ছি তোমাদের কাছে রমজানের প্রকৃত অর্থ কী? তোমরা এর থেকে কী পেতে চাও?"

তারা দুজনেই চুপ করে রইলো। ধর্মীয় ব্যপারে কখনোও তাদের মতামত চাওয়া হয় না। একজন মুসলিম হিসাবে ছোটবেলা থেকে তুমি সাধারণত সেটাই করো যেটা তোমার বাবা মা তোমাকে করতে বলেন। কোন প্রশ্ন করার সুযোগ যেন নেই।

"ফুফু" ফারাজ বললো, "রমজান অন্য সব কিছুর মতই। বাকিরা যা করে আমরাও তাই করি। এটা পরিবার আর খাবার নিয়ে। ঘটা করে ইফতার করা। মসজিদে যাওয়া। এটা শুধু একটা নিয়ম পালন করা।"

"আমি বলতে চাচ্ছি তোমরা রমজান মাস শেষে কী অর্জন করতে চাও? তোমরা কী পাওয়ার আশা করো?"

আবার তারা কিছু সময় চুপ হয়ে গেলো। এবার ফারহানা মুখ খুললো।

"আমার মনে হয় আমি নিজের কাছে প্রমাণ করার চেষ্টা করবো যে, আমি সারা মাস রোজা রাখতে পারি..। আমি এর আগে কখনোই পুরো এক মাস রোজা রাখিনি।"

ফারাজও মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো। "আমার মনে এটা একটা চ্যালেঞ্জের মত। কারণ এটা কঠিন। তাই না? প্রশ্ন হচ্ছে তুমি পারবে কি না?"

"আর শুধু না খেয়ে থাকাই তো না। তাই না?" ফারহানা যোগ করলো, "অন্য অনেক কিছুও তো আছে এর সাথে। সেসব কাজ থেকে বিরত থাকা যেগুলো তুমি জানো তোমার করা উচিৎ না।"

"একজন মানুষ হিসাবে, একজন মুসলিম হিসাবে নিজেকে আরও উন্নত করা।"

"নিজের আদর্শ অনুযায়ী চলার চেষ্টা করা।"

নাজমা ফুফু ওদের দুজনের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। "আমি তো এতক্ষণ এটাই জানতে চাচ্ছিলাম! আমাদেরকে মনে রাখতে হবে আমরা খুবই ভাগ্যবান যে আরেকবার রমজান আমাদের জীবনে আসছে। এটা অনেকটা নিজেকে শোধরানোর আরেকটা সুযোগ পাওয়ার মতো। আরও ভালো হওয়ার সুযোগ। আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার আর একটি সুযোগ পাওয়া। আমাদের সবার কাছেই সুযোগ আছে এই মাসকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলার। আমি তো আর অপেক্ষাই করতে পারছি না!" তিনি তার ব্যাগের মধ্যে খুঁজতে লাগলেন, "দেখো আমি এই সব কিছু মনে রাখার জন্য এই বইটা পড়ছি।"

তিনি তাদেরকে বইটা দেখালেন, 'কুরআন এবং সুন্নাহর আলোকে রামাদান'।

ফারহানার চোখ ঝলমলিয়ে উঠলো। যখনই সে নতুন কোন বই দেখে এরকমই হয়।

"আমি কি এটা কিছুদিনের জন্য ধার নিতে পারি ফুফু?"

"অবশ্যই। কিন্তু শর্ত হচ্ছে ফারাজকেও পড়তে দিতে হবে।"

"তাহলে ফুফু আপনি আমাকে আগে দিন। না হলে ফারহানার রুমে একবার ঢুকলে এই বই আর খুঁজে পাওয়া যাবে না!"

তারা সবাই একসাথে হেসে উঠলো। নাজমা ফুফু তাদের হাতে বই দিলেন।

তারপরেই তাদের খাবার চলে আসলো। আর তারা কোন কথা না বলেই খাওয়া শুরু করলো। ওদের মনেই ছিলো না যে দুপুর থেকে খাওয়া হয়নি।

ফারাজ তার কোলের উপর খুলে রাখা বইয়ের দিকে তাকালো। সেখানে একটি বাক্যের উপর তার নজর পড়লো–

"তোমাদের উপর সাওম নাজিল হয়েছে যাতে তোমরা নাজাত অর্জন করতে পারো।"

সে কি কখনও পারবে? বিশ্বাসের সেই পর্যায়ে পৌঁছাতে? পাগলামি থেকে দূরে থাকতে? সে চেষ্টা করতে চায়। মন থেকে চেষ্টা করতে চায়। এই বছর সে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে। কিন্তু তার মধ্যে অবিশ্বাসী চিন্তা ফিসফিসিয়ে উঠলো। স্ক্রুজ কী বলবে? আর তার বাকি বন্ধুরা? ওরা কী ভাববে?

সে সব চিন্তা একদিকে সরিয়ে রাখলো। এই জায়গায়, এই মুহূর্তে নাজাত ছাড়া আর কিছুই চায় না। নিজের কাছে নিজের সন্তুষ্টি চায়।

সে বড় করে একটা নিশ্বাস নিলো। সে এটা করবেই ইনশাআল্লাহ্। তাকে শুধু একাগ্র হতে হবে।

সেই রাতে সবাই ঘুমিয়ে যাওয়ার পরেও ফারহানা অনেক রাত পর্যন্ত জেগে রইলো। সে বিছানায় বসলো। তারপর পায়ের উপর চাদর টেনে দিয়ে টেবিল ল্যাম্পের আলোয় লেখা শুরু করলো। সে তার নিজের লিস্টটা বানাচ্ছিলো।

সারা বিকাল সে শুধু তার ফুফুর বলা কথাগুলোই ভেবেছে। সারাটা বিকাল। সে নিজেকে বারবার জিজ্ঞাসা করেছে, তুমি কী চাও? তুমি কোথায় যাচ্ছো? কীভাবে তুমি নিজেকে উন্নত করতে পারবে?

এখন সে তার সব প্রশ্নের জবাব খোলা পৃষ্ঠায় লিখেছে। তার কাছে মনে হলো লেখার সাথে সাথেই যেন এগুলো সব সত্যি হয়ে যাচ্ছে । যেন লেখাগুলো খাতার পাতায় জীবন্ত হয়ে উঠছে।

সময়মত নামাজ পড়া।
বেশি বেশি কুরআন পড়া।
গীবত না করা।
দান করা।
গরীবদের সাহায্য করা।
ভালোভাবে পড়াশোনা করা।
সময়মত হোমওয়ার্ক করা।
তাহাজ্জুদ পড়া।
তার চোখ আবার সাদা হিজাবের দিকে চলে গেলো। সে হাত কচলাতে কচলাতে মনে মনে বললো-
হিজাব পরা শুরু করা।
সে কি আসলেই পারবে?
একটা বিষয়ে সে নিশ্চিত ছিলো। একবার যদি সে হিজাব পরা শুরু করে, আর কখনও খুলবে না। কিছুদিন পরে না। ঈদের পরেও না। সে ভান করবে না। কিন্তু সে কি আসলেই হিজাব পরার জন্য তৈরি ছিলো? পৃথিবীর সবার বিরুদ্ধে গিয়ে? হিজাব তো শুধু চুল ঢেকে রাখা নয়। এটা নিজের মনের পরিবর্তনেরও ব্যপার। বিনয়ী হওয়া, অন্তরে আল্লাহকে ভয় পাওয়া। নিজের কাজ সম্পর্কে সচেতন থাকা। জবাবদিহিতার জন্য তৈরি থাকা। ইসলামের জীবন্ত প্রতীক হয়ে জীবন যাপন করা।
নাজমা ফুফুর সাথে অনেক আলোচনা করে, মায়ের সাথে তর্ক করে, আগে থেকেই হিজাব পরিধানকারী বান্ধবী সাজিয়ার সাথে (যদিও অনিচ্ছায়) ঝগড়া করে ফারহানা এ ব্যাপারে কিছুটা জানে। ফারহানা এখন অন্তত এটুকু বিশ্বাস করে যে হিজাব ফরজ। ইবাদাতের একটা অংশ। যার উত্তম প্রতিদান দেওয়া হবে।
এটা আসল সমস্যা না।
আসল সমস্যা হচ্ছে সে কি পারবে পর্দার মর্যাদা রাখতে। কিংবা স্কুলের সবার নেতিবাচক মন্তব্য এড়িয়ে যেতে।

"আর আমি জীন এবং মানবজাতিকে আমার ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছি।"

যদি এটাই তার জীবনের উদ্দেশ্য হয়, তাহলে সে কেন এই পদক্ষেপ নিতে ভয় পাচ্ছে?

সে ভাবতে লাগলো। স্কুলের মেয়েরা কী ভাবলো তাতে আমার কি এসে যায়? কিংবা আমার শিক্ষকরা? স্কুল শেষে তারা বাড়ি ফিরে যান। তারা তাদের জীবনে, তাদের পরিবারের কাছে ফিরে যান। তারা তো আমার চিন্তা করে তাদের জীবন কাটাচ্ছেন না।

ফারহানা মনে মনে বারবার নিজের সাথে নিজের তর্ক-বিতর্ক চালালো। একজন মানুষের নাম বারবার তার সামনে আসছিলো। মালিক! কিন্তু সে ইচ্ছা করে দূরে সরিয়ে দিয়েছে তাকে। সে অন্যের মতামতকে নিজের জীবনে প্রভাব খাটাতে দেবে না। আর কখনও না।

যতক্ষণ না সে লাইট বন্ধ করলো, সে মানসিকভাবে ক্লান্ত হয়ে গেছে। কিন্তু নিজের মন থেকে আসা কথায় সে সন্তুষ্ট। আমি এটা করবোই। যদি এটা আমার জন্য সঠিক হয়, তাহলে আল্লাহ্ সবকিছু সহজ করে দেবেন। আমাকে শুধু তার উপর বিশ্বাস রাখতে হবে।

লাইট বন্ধ করার আগে সে ছোট্ট করে তার খাতার লিস্টে লিখলো

মালিককে ভুলে যাওয়া।

বারান্দার অপর প্রান্তে ফারাজ তার রুমে এশার নামাজ পড়ছিলো। দিনের শেষ নামাজ। এই ওয়াক্তের নামাজই সে সবচেয়ে বেশি পড়েছে। এটার জন্য তাকে সকালে ঘুম থেকে উঠতে হয় না। কিংবা দুপুরের খাওয়ার সময় পড়তে হয় না।

হে আল্লাহ্! রমজান আসছে।

আমার নিজেকে শোধরাতে হবে।

আর সময় নষ্ট নয়।

বাজে কাজ নয়।

শুধু তোমার আর আমার জন্য সবটুকু সময়।
একে অন্যের।
এই ফারাজ হয়ে সেটা সহজ হবে না। স্কুলে সবাই ভাবে আমি লুজার, গাধা। কিন্তু স্ক্রুজ অন্য কথা বলে। সে আমার নাম দিয়েছে 'ধ্বংসের রাজা ফারাজ।' সে বলে আমার মধ্যে এটা প্রমাণ করার শক্তি লুকিয়ে আছে। আমি কিছু একটা হবো।
কিন্তু এই মাসে না। এখন না। এই মাসে আমি মুসলিম হতে চাই। একজন ভালো ছেলে। একজন ভালো পাকিস্তানি মুসলিম ছেলে। যে নিয়মিত মসজিদে যায়। সালাত আদায় করে। ঝামেলা থেকে দূরে থাকে।
হ্যাঁ আমি পারবো এক মাসের জন্য ভালো হয়ে থাকতে। ইনশাআল্লাহ্।
অন্তত ঈদের আগ পর্যন্ত স্ক্রুজকে দূরে রাখা সম্ভব। ফারাজ চায় না তার জীবনের ঐ অংশটা এই পবিত্র মাস রমজানকে নষ্ট করে দিক।

তৃতীয় অধ্যায়
বিপদের সূচনা

সোমবার সকালে দুই ভাই-বোন একসাথে হেঁটে বাস স্ট্যান্ডে গেলো। ওরা যখন ছোট ছিলো, তখন দুজনকে আলাদা করা প্রায় অসম্ভব ছিলো। মাঝে মাঝে একসাথে থাকলে ওদের কথা বলারও প্রয়োজন হতো না। ওরা একজন কী ভাবছে, কী অনুভব করছে এগুলো অন্যজন কিছু না বলেই বুঝে যেতো যেন। কিন্তু সময় বদলে গেছে। হাইস্কুল আর কৈশোরে পা দেওয়ার সাথে সাথে ওদের মধ্যেকার দূরত্ব বেড়ে গেছে। একজন আরেকজনকে বোঝার ক্ষমতাও যেন হারিয়ে ফেলেছে। এখন ওরা যখন চুপ থাকে শুধুমাত্র নিজের চিন্তাতেই মগ্ন থাকে। আরেকজনের মনের গভীরে লুকানো কথা অজানাই রয়ে যায়।

কিন্তু নাজমা ফুফুর সাথে ঘুরে বেড়ানো তাদের দুজনকে আবার কাছে নিয়ে আসতে শুরু করেছে। তারা আবার খোলামেলা ভাবে কথা বলছে।

ফারহানা প্রথমে কথা বললো, "তুমিও কি তাহলে রমজানের প্রস্তুতি নিচ্ছো?"

ফারাজ মাথা নাড়ালো, "আমি ঠিক করেছি এ বছর সবকিছু ভালোভাবে পালন করবো।"

"হ্যাঁ আমিও" ফারহানা বললো। গত সপ্তাহে নাজমা ফুফুর সাথে কথা বলে আমিও রমজান নিয়ে ভাবতে শুরু করেছি। আসলেই আমার কাছে এটার গুরুত্ব কতোখানি...।"

"তুমি বলতে চাচ্ছো যে এটা শুধু মাত্র না খেয়ে থাকা নয়। বরং নিজেকে ভালো মানুষ হিসাবে পরিবর্তন করার একটা সুযোগ?"

"হ্যাঁ ঠিক তাই" ফারহানা তার ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে হাসলো। সে দেখেছে নাজমা ফুফুর কথা শুনে তার ভাইয়ের মুখও তার মতই উজ্জ্বল হয়ে গিয়েছিলো। 'নাজাতের মাস' ফুফু বলেছিলেন। এই মাসে সব গুনাহ

মাফ হয়ে যেতে পারে। আল্লাহ নিজের হাতে বান্দার ত্যাগের জন্য তাকে পুরস্কৃত করেন।

"আমি কিছু কিছু জিনিসে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করবো" ফারহানা জোর দিয়ে বললো।

"তো মালিকের কী হবে তাহলে?" ফারাজ মালিকের সাথে ফারহানার সম্পর্ক নিয়ে অল্প-স্বল্প জানতো। কিন্তু এতটুকুই যথেষ্ট।

"এ বিষয়ে কথা বলবে না ফারাজ" ফারহানা অন্যদিকে তাকিয়ে ফিসফিসিয়ে বকলো। "এখন আর আমাদের মধ্যে কিছুই নেই।" তারপর সে তার ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললো, "তুমি কী করবে? ক্লুজ আর বন্ধুদের ব্যাপারে ভেবেছো?"

"আমার মনে হয় আমি ওদের কিছুদিন আমার থেকে দূরে রাখতে পারবো।"

"হ্যাঁ আমার মনে হয় সেটাই ভালো হবে। আমি জানি না ওদের সাথে তুমি কেন ঘুরে বেড়াও। আর এই বছরটা নষ্ট করা উচিৎ হবে না। কিছুদিন পর পরীক্ষা।" সে জানতো ফারাজের মাথায় পরীক্ষা নিয়ে কোনও চিন্তা-ভাবনাই নাই। সে এসব নিয়ে কখনও ভাবেও না।

"পরীক্ষা? ওহ আচ্ছা হ্যাঁ পরীক্ষা। আরে কোন সমস্যা নেই।"

ফারহানা তার ভাইয়ের দিকে তাকালো। তার চোখে কষ্টের ছাপ। "তুমি যদি ঠিক মত পড়াশোনা করতে, তাহলে তুমি ওদের সবার চাইতে এগিয়ে থাকতে।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা সবাই জানি, আমাদের দুইজনের মধ্যে তুমি বেশি মেধাবী!" ফারাজ মানুষের মুখে এটা অনেকবার শুনেছে। কিন্তু তার এখনও খারাপ লাগে।

"এগুলো ফালতু কথা ফারাজ! এটা তুমিও জানো।" ফারহানা রেগে গেলো। তারপর আবার ভাইয়ের উদ্দেশ্যে বললো, "তোমাকে শুধু আরেকটু চেষ্টা করতে হবে। আর কিছু না।"

“ঠিক আছে। ঠিক আছে! আজ আর কোন লেকচার না। তোমার যুক্তি আমি বুঝেছি!” ফারহানা তার মাথায় স্কুল ব্যাগ দিয়ে মারতে গেল। ফারাজ মাথা সরিয়ে নিলো।
“তোমরা দুইজন আবার শুরু করেছো?” ফারহানার বান্ধবী সাজিয়া তাদের পিছনে দাঁড়িয়ে বলল । তার চোখে মুখে হাসি।
“হেই সাজিয়া!” ফারহানা তার বান্ধবীকে জড়িয়ে ধরলো। “আসসালামু আলাইকুম। তুমি দেরি করে ফেলেছো।”
“ওয়ালাইকুম আসসালাম” সাজিয়া হালকা করে জবাব দিলো। “হ্যাঁ আমি কাল রাতে ঠিকমত ঘুমাতে পারিনি। মায়ের কিছু কাজ করে দিচ্ছিলাম।”
ফারাজ এক পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলো। সে চেষ্টা করছে সাজিয়ার দিকে না তাকাতে। ইমাম শাকিরের মেয়ে। তার বোনের ছোটবেলার বান্ধবী। তার স্বপ্নের রাজকন্যা। কিন্তু সে সাজিয়ার উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারছে। তার সাদা হিজাবে ঢাকা চুলের ঘ্রাণ বুঝতে পারছে।
ভদ্রতার খাতিরে তাকেও কথা বলতে হবে। “আসসালামু আলাইকুম সাজিয়া” ফারাজ কোনমতে বললো। সে ঘেমে একাকার হয়ে গেছে।
“ওয়ালাইকুম আসসালাম ফারাজ” সাজিয়া তার দিকে এক পলক তাকিয়ে উত্তর দিলো।
তারপর তারা যেন একটা গর্জন শুনতে পেলো। গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ ভেসে আসছে। চাকাগুলো রাস্তার সাথে ঘষা লেগে শব্দ তৈরী করছে। তাদের শান্ত রাস্তায় সেটা আরো জোরে শোনাচ্ছে।
একটা কালো চকচকে বিএমডব্লিউ তাদের সরু রাস্তা দিয়ে দ্রুতবেগে চালিয়ে আসছে। জানালার ঝাঁকি, ইঞ্জিনের তেজ আর ভিতর থেকে আসা মিউজিক যেন রাস্তাটাকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে।
ফারহানা আর সাজিয়া দুজনেই গাড়ির জানালায় বিসমিল্লাহ্ লেখা দেখে ভ্রূ কুঁচকালো। গাড়িটা অনেক জোরে এসে হঠাৎ করে তাদের একদম সামনে থেমে গেলো।

কী গাড়ি! ফারাজ মনে মনে ভাবলো। তার কখনোই অন্য ছেলেদের মত এসব জিনিসে আগ্রহ ছিলো না। কিন্তু এই গাড়িটার লাইন, চাকা, ইঞ্জিন পাওয়ার সবকিছু দেখে সে রীতিমত মুগ্ধ।
গাড়ির পিছনের জানালা নামিয়ে হাতে ব্রেসলেট আর রূপার আংটি পরা একটা এশিয়ান ছেলে মাথা বের করে দিলো।
"ফারাজ!" সে ডাকলো, "কি অবস্থা বন্ধু?"
সাজিয়া ফারহানার দিকে তাকালো, "ফারাজ এই ছেলেগুলোকে চেনে?"
ড্রাইভারের দরজা খুলে আরেকটা এশিয়ান ছেলে নেমে আসলো। পুরো দানবের মত দেখতে। বিশাল পেশীবহুল শরীর। প্রায় পুরোটাই ট্যাটু দিয়ে ঢাকা। টাইট জিন্স ও হুডি পরা। গলায় মোটা সিলভারের চেইন ঝুলছে। সসেজের মত আঙুলে হিরার আংটি। কালো চুল এত ছোট করে কাটা যে, চকচকে খুলি দেখা যাচ্ছে।
ফারহানা সাথে সাথেই চিনে ফেললো। এটা স্ক্রুজ।
"কি খবর বন্ধু!" সে ফারাজকে বললো। ফারাজ তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে হাত মেলালো। স্ক্রুজ তাকে কাছে টেনে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলো। তার সিগারেট ধরা হাত ফারাজের পিঠে, কিন্তু চোখ ফারহানার দিকে।
ফারহানা দেখলো কীভাবে স্ক্রুজের চোখ তার সারা দেহ বুলিয়ে যাচ্ছে। সে কেঁপে উঠলো। স্ক্রুজ তার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপ দিলো। ফারহানা অসহায় হয়ে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলো।
তারপর স্ক্রুজ ফারাজের দিকে তাকালো।
"তুমি কোথায় ছিলে বন্ধু?" সে জিজ্ঞাসা করলো। "চলো তোমাকে স্কুলে নামিয়ে দিই। আমি আমার ছোট ভাইকে পৌছে দিতে যাচ্ছি।"
"তুমি সত্যি বলছো?" ফারাজের চোখ বড় বড় হয়ে গেল।
"হ্যাঁ অবশ্যই" সে পিছনের দরজা খুলে দিলে ফারাজ প্রায় লাফ দিয়ে চড়ে বসলো। সে চামড়ার সিটে হাত বুলালো। সেগুলো গানের তালে কাঁপছিলো। ওয়াহ!
স্ক্রুজ ফারহানা আর সাজিয়ার দিকে তাকালো।
"তোমরাও চাইলে আসতে পারো" সে সিগারেটে টান দিয়ে বিশ্রিভাবে হেসে বললো।

"উমমমমম না। দরকার নেই " ফারহানা কোনমতে বললো, "আমাদের বাস চলে এসেছে। ধন্যবাদ।" তারপর সাজিয়ার হাত ধরে দাঁড়িয়ে থাকা বাসে উঠে গেলো।

তারা শুনতে পেলো গাড়ির ইঞ্জিন আবার চালু হচ্ছে। রাবারের চাকা পিচের সাথে গর্জন করতে করতে গাড়িটা চলে গেলো।

তারা দুইজনেই অনেকক্ষণ কোন কথা বললো না।

তারপর সাজিয়া ফারহানার দিকে ফিরে বললো, "তোমার ভাই বিপদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অবশ্যই সে বিপদের দিকেই যাচ্ছে।"

চতুর্থ অধ্যায়

সংস্কার

ফারহানা স্কুলে যেতে ভালোবাসে। ভাগ্যিস তার বাবা মা তাকে ফারাজের মত কম্বাইন্ড স্কুলে না দিয়ে লোকাল একটা গার্লস স্কুলে দিয়েছেন! যদিও তাদের আসল উদ্দেশ্য ছিলো তাকে ছেলেদের থেকে দূরে রাখা। কিন্তু মিডলটন স্কুল সত্যিকার অর্থেই একটা ভালো স্কুল। বিশেষ করে এখানকার পড়ানোর পদ্ধতি, পরিবেশ সব কিছুই ফারহানার পছন্দের। শুধু ফারাজকেই শহরের পরিবেশ, বিরক্তিকর শিক্ষক আর গুন্ডা টাইপের লোকজনের সাথে মানিয়ে নিতে হচ্ছে।

ফারহানা সারাদিন তার ক্লাস, বাস্কেটবল, ডিবেট ক্লাব, লাঞ্চব্রেকের গসিপ ও বন্ধুদের দল নিয়েই ব্যাস্ত থাকে। প্রথম থেকেই সে সবার কাছে পরিচিত মুখ। সবাই তাকে পছন্দ করে ও ভালোবাসে। ফারহানার শিক্ষকরাও সবসময় ওর প্রশংসা করেন। প্রথম বছর থেকেই তারা বলতেন, ফারহানা মেধাবী ও পরিশ্রমী। সে তাদের মুখ একদিন উজ্জ্বল করবে। "যদি না বলিউডের এইসব ছাইপাশ তোমার মাথায় ঢোকে!"

আর ফারহানার কাছে পড়াশোনা সব সময় সহজ মনে হয়। তার মাথায় যে কোন গল্প, অংক বা গ্রাফ সহজেই ঢুকে যায়। সে সব কিছু মনোযোগ দিয়ে কয়েকবার পড়ে মাথার এক কোণে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখে। পরে এগুলো সময় মত কাজে লাগায় । সেজন্য বিতর্ক কিংবা পরীক্ষায় ভালো মার্কস পেতে তাকে খুব বেশি কষ্ট করতে হয় না। তার বাবা মা মেয়ের এই গুণ নিয়ে গর্ব করতেন। আম্মাজি যেন কি বলতেন? 'ফারহানা খুবই বুদ্ধিমতী মাশাআল্লাহ্। ওকে আর সাজিদকে খুব মানাবে।'

যখনই ফারহানা তার করাচীতে ডাক্তারি পড়া 'নম্র-ভদ্র' খালাতো ভাইয়ের কথা ভাবে তার বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে কৌতুহলের জন্য আর মাঝে মাঝে ক্ষোভে। যদি আমার 'নম্র-ভদ্র' ছেলে পছন্দ না হয় তখন?

কিন্তু এসব বিদ্রোহ অন্য সময়ের জন্য। আরো অনেক সময় পরে। সে জানতো তার বাবা মা চায় তার আর সাজিদের বিয়ে হোক কিন্তু কখনোই সরাসরি তার সামনে বলেন না। ফারহানা একেবারেই চায় না তার খালাও এ বিষয়ে কথা বলা শুরু করুক। হাস্যকর হলেও ফারহানা অন্যসব এশিয়ান মেয়েদের মতই পাশাপাশি দুইরকম জীবন যাপন করে। স্কুলে একরকম বাসায় অন্যরকম। স্কুলে সে বুদ্ধিমতী, চঞ্চল আর সবার সাথে কথা বলা ও গল্প করা একটা মেয়ে। কিন্তু বাসায় সে একেবারেই অন্যরকম। বেশ শান্তশিষ্ট; কখনো নিজে থেকে কোন বিষয়ে মতামত দিতে যায় না। সবসময় মনোযোগ দিয়ে বড়দের কথা শোনে। যখন তার বড়দের চিন্তা ভাবনা বা উপদেশ ভুল মনে হয় তখনও সে তর্ক করে না। মনে হয় যেন দুই ফারহানা দুইজন আলাদা মানুষ। স্কুলের শিক্ষকরা হয়তো বাসার বাধ্য মেয়ের মধ্যে তাদের দুরন্ত ছাত্রীকে চিনতেই পারবেন না। আর বাবা মা তো বিশ্বাসই করতে পারবেন না যে তাদের ধীর স্থির ফারহানা শিক্ষকদের সাথে তর্ক করে, বন্ধুদের ক্ষ্যাপায় ও অন্যদের কাছে সে বলিউডের রানী।

কিন্তু সেই বা কী করবে? তার বাবা মায়ের চাইতে তার বাইরের জগৎ সম্পূর্ণ আলাদা। তার মায়ের জন্ম পাকিস্তানে, বড়ও হয়েছেন সেখানে। তিনি তো তার মত কোনদিন "Of Mice and Men" পড়ে কাঁদেননি। আর বাবা তো ষোল বছর বয়সেই স্কুল ছেড়ে নিজের রেস্টুরেন্টে কাজ করা শুরু করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ নিয়ে তার ভাবার সময় কই। তাদের কেউ কি থিওরি অব রিলেটিভিটির ব্যাখা দিতে পারবে? কিংবা পারবে বলতে পাঁচটা নবায়নযোগ্য শক্তির নাম? তাদের জগতে শুধু পরিবার আর পত্রিকার দোকান ছাড়া কিছুই নেই।

বই পড়া এবং পৃথিবীর নানা রকম বিষয় নিয়ে চিন্তা করার জগৎ শুধু ফারহানার একার। সে তার মায়ের সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা টেবিলে ও বিছানায় বসে বসে এগুলোতেই ডুবে থাকে। মাঝে মাঝে হয়তো ফারজ আগ্রহ দেখায় কিন্তু তারপরও বেশিরভাগ সময় ফারহানা এগুলো নিজের গোপন ভালোবাসার মত লুকিয়ে রাখে। লুকিয়ে না রেখে উপায় কি? এই

বছর তার GCSE পরীক্ষা। আর তার শিক্ষকরা বলেছেন সে আর্ট ছাড়া সব বিষয়ে এ পাবে। ফারহানা যাচ্ছেতাই ছবি আঁকে। কিন্তু ফারাজ খুব সুন্দর ছবি আঁকতে পারে। ফারহানার মতে তার ভাই ছবি আঁকার অসম্ভব প্রতিভা নিয়ে পৃথিবীতে এসেছে। শুধু যদি এগুলো নিয়ে সে একটু ভাবতো।

"তো ফারহানা" নাজমা ফুফু একদিন ফারহানাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন "তুমি বড় হয়ে কী হতে চাও?"

ফারহানা হেসে বলেছিলো "সত্যি বলবো?"

সে তার ফুফুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলো "আমি এ লেভেল শেষ করে অনেক দূরের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যেতে চাই। অনেক অনেক দূরে কোথাও।" সে তার ফুফুর চোখের দিকে অপলক তাকিয়ে ছিলো। যেন সে চাইছিলো তার ফুফু একবার হলেও তাকে বলুক সে অসম্ভব কিছু চাইছে, তার বাবা মা কখনোই রাজী হবেন না।

কিন্তু নাজমা হেসে বলেছিলেন "আমার মত?"

ফারহানা মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছিলো "হ্যাঁ আপনার মত।"

সে কখনো এই কথাগুলো তার বাবা মাকে বলেনি। সে জানে তার বাবা মা চান ফারহানা এখানকার কোন একটা কলেজে পড়াশোনা শেষ করে স্কুলে চাকরি করবে। অন্তত যতদিন তার বিয়ের বয়স না হয়। কিন্তু নাজমা ফুফুর সাথে কথা বললে বড় স্বপ্ন দেখতে ইচ্ছা করে।

কিন্তু এখনো বিয়ে নিয়ে কোন আলোচনা শুরু হয়নি। এখন শুধু পড়াশোনা, টাউন সেন্টারে ঘুরে বেড়ানো, গোপনে মেসেজ পাঠানো আর একটু আধটু প্রেম। কিন্তু সিরিয়াস কিছু না।

অন্তত যতদিন তার জীবনে মালিক আসেনি।

সে একবার সাজিয়াকে জিজ্ঞাসা করেছিলো "তোমার বাবা মা কি কখনো বাসায় কোন ছেলেকে নিয়ে আসার অনুমতি দেবে?"

"তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?" সাজিয়ার চোখ প্রায় কপালে উঠে গিয়েছিলো। "কোনদিন না! কথা বলা তো দূরে থাক, আমার বাবা যদি

জানে আমি কোন ছেলেকে চিনি তাহলেই তো ঘরে তালা মেরে রাখবে। আর আমি কাউকে বাড়ি নিয়ে আসবো? প্রশ্নই ওঠে না!"
"আমি বুঝি না এশিয়ান বাবা মায়েরা এত কড়া কেন হয়" তাদের বান্ধবী রবিনা মাঝখান থেকে বলেছিলো। "তারা ছেলেমেয়েদের নিজের মত করে কেন বড় হতে দেয় না? তাদের এত মাথা ব্যাথা কেন? আমার বান্ধবী কেটিকে দেখো, ওর মা কতো কুল! ও ইচ্ছা মত বাড়িতে ছেলে নিয়ে আসে। কোন সমস্যাই নেই। ওর মা ছেলেগুলোকে রাতে থাকতে পর্যন্ত দেন।"
সাজিয়ার চোখ আরও বড় হয়ে গেলো। "কি? এগুলো কোন ধরনের পাগলামী!"
কিন্তু রবিনা মুখ বাঁকিয়ে বললো "কেটির মা বলে এটা আরো ভালো যে কেটি ছেলেদের নিয়ে বাড়িতে আসে। এখানে ওরা তার চোখের সামনে থাকে। তিনিও মেয়ের উপর নজর রাখতে পারেন। তার চোখের আড়ালে ঘুরে বেড়ানোর চাইতে এটা অনেক ভালো। আমার কাছে তো ওনার কথাবার্তা ঠিকই মনে হয়।"
"হ্যাঁ কিন্তু কেটি তো এই দেশি, সে এশিয়ান না তাই না?" ফারহানা বললো। "আমাদের তো ছেলেদের সাথে কথা বলারই অনুমতি নেই। আর ঘুরে বেড়ানো তো অনেক দূরের কথা"।
রবিনা চোখ উল্টালো। "উফফ থামো তো! যত্তসব ন্যাকামি! হাজারটা এশিয়ান মেয়ে বাবা মায়ের থেকে লুকিয়ে ছেলেদের সাথে ঘুরে বেড়ায়। আমার বোনকেই জিজ্ঞাসা করে দেখো। আর করবেই না কেন? শুধু সাদারা আর ছেলেগুলোই মজা করবে? আমরা কেন চুল খুলে নিজের জীবনকে উপভোগ করবো না। কিছুদিন পর তো এমনিতেই রান্নাঘরে শিকল পরে রুটি বানাতে হবে। আর আমাদের স্বামীরা পায়ের উপর পা তুলে টিভি দেখবে।"
রবিনার কথা শুনে ওরা সবাই হেসে ফেলেছিলো। কিন্তু রবিনার সব নিয়ম কানুন ভাঙার ডাক ফারহানার মনের মধ্যে খচখচ করতে লাগলো। সে কি

কেটি আর তার মায়ের মত জীবন চায়? ওরা মা মেয়ে একই রকম জিন্স, টপস পরে। একসাথে ক্লাবে যায় আর ছেলেদের সাথে আড্ডা দেয়।
সে তার নিজের মায়ের কথা ভাবলো। সবসময় সালোয়ার-কামিয পরেন। সব প্রথা আচার অনুষ্ঠান মেনে চলেন। যখন সে স্কুল থেকে বাড়িতে ফিরে যায় তার মা সব সময় বাড়িতে থাকেন। নাহ সে অন্যরকম জীবন চায় না....।
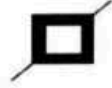
"তাহলে তোমরা কি সামনের সপ্তাহে এশিয়ান গার্ল ব্যাচেলর পার্টিতে আসছো?" ক্লাসে যাওয়ার পথে রবিনা সাজিয়া আর ফারহানার হাতে একটা বিজ্ঞাপনের কাগজ দিতে দিতে বললো। বিজ্ঞাপনে একটা বিকিনি পরা কালো চোখের মেয়েকে দেখা যাচ্ছে। সে ডিজাইনের কাপড় আর ডায়মন্ডের কানের দুল পরা এক লোকের কোমর পেচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।
সাজিয়া বিরক্তিতে তার নাক কুঁচকে ফেললো। "ছিঃ কি নোংরা! কি একটা সস্তা বিজ্ঞাপন!"
"এগুলো তোমার মত মেয়েদের জন্য না সাজিয়া" রবিনা হেসে বললো। "আমার তো মনে হয় এটা অনেক জমকালো হবে আর আমার বোন নিশ্চয়ই আমাদের জন্য টিকিট এনে দিতে পারবে। এশিয়ান গার্লের সকল কর্মচারী বিনামূল্যে ঢুকতে পারবে।"
ফারহানার মনে পড়লো কতোদিন তারা রুমের মধ্যে লুকিয়ে লুকিয়ে এশিয়ান গার্লের ব্যাচেলর কপি পড়েছে। কোন ছেলেটা বেশি হট, কোন ছবিগুলো বেশি সুন্দও আর কারা বেশি মেকাপ করেছে এসব নিয়ে কতো আলোচনা হতো। একবার ফারাজ তাদের ধরে ফেলেছিলো। তারপর অনেকদিন এটা নিয়ে ইয়ার্কি করেছে। কিন্তু অবশেষে ফারহানা বাবা মায়ের থেকে লুকানোর জন্য ম্যাগাজিনটা ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছে।
"তো পার্টি কবে শুরু হবে?" ফারহানা জিজ্ঞাসা করলো। তারপর সে নিজেই ভাবলো এমনভাবে জিজ্ঞেস করছি যেন আমি যাবো!

রবিনা আবার ভালোভাবে বিজ্ঞাপনের কাগজ দেখলো। "এখানে লেখা আছে শনিবার রাতে।"

"কিন্তু তখন তো আমরা রোজা রাখা শুরু করবো। রমজান শুরু হয়ে যাবে..." ফারহানা মোবাইল বের করে মেসেজ চেক করতে করতে বললো। তারপর সে ডিলিট বাটনে চাপ দিলো। আজকে এই নিয়ে মালিকের পাঁচটা মেসেজ ডিলিট করেছে ফারহানা।

"তো? অন্তত ছুটির দিনে তো হচ্ছে তাই না?"

"উফফ গাধার মত কথা বলো না তো রবিনা!" সাজিয়া রেগে গেছে। "তুমি রমজানে পার্টি করতে যাবে?"

রবিনা তাচ্ছিল্যের সাথে মুখ ঘুরালো। "আমার বয়স এখন ষোল। আমার বাবা মায়ের সব কথা শুনতে হবে নাকি? তাছাড়া আমি আমার বোনের সাথে গেলে নিশ্চয়ই সমস্যা হবে না...।"

ফারহানা আর সাজিয়া একজন আরেকজনের মুখের দিকে তাকালো। রবিনা ওর বড় বোন তাসনিমের সাথে ঘুরে বেড়ানোর পর থেকে অনেক বদলে গেছে। তাসনিম একটা জনপ্রিয় এশিয়ান ম্যাগাজিনে বেশ ভালো পদে চাকরি করে। প্রত্যেক সপ্তাহে ছুটির দিনে ক্লাবে যায়। একটা সময় ছিলো যখন তারা সবাই এক রকম ছিলো আর এখন....।

"আমি তাহলে যাচ্ছি না" ফারহানা অবশেষে বললো। "রমজানে অনেক কাজ থাকে আর আমি ভেবে রেখেছি এই বছর সব ঠিকভাবে পালন করবো।"

"আচ্ছা আচ্ছা যা ইচ্ছা করো!" রবিনা অভিমানের স্বরে বললো। "আমি এসে তোমাদেরকে গল্প শোনাবো কতো মজা করেছি সেটা নিয়ে ঠিক আছে? তোমাদের জন্য ছবিও তুলে নিয়ে আসবো।"

"দরকার নেই" সাজিয়া বিড়বিড় করে বললো। কিন্তু খুব বেশি আস্তেও না।

রবিনা অনেকক্ষণ সাজিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকলো। "একটা কথা কি জানো সাজিয়া?" সে ধীর ঠাণ্ডা গলায় বললো। "আমার মনে হয় তোমার আসলেই শেখা উচিত কীভাবে জীবনকে উপভোগ করতে হয়।"

কথা শেষ করেই রবিনা মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে চলে গেলো। বাকি দুইজন ওর চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইলো।

“এই মেয়ের মাথা খারাপ হয়ে গেছে!” সাজিয়া আর্ট ক্লাসে ঢুকতে ঢুকতে বললো।

পঞ্চম অধ্যায়
সেরা শিল্পকর্ম

ফারাজ একটা লম্বা কাগজের সামনে বাঁকা হয়ে বসে আছে। তার চারপাশে এগারো বছর বয়সের নানারকম অবাধ্য শব্দ ভেসে যাচ্ছে। যেন বইয়ের পাতা উল্টানোর শব্দ, চেয়ার সরানোর শব্দ, ঠাস করে কেউ দরজা লাগানোর শব্দ ও ফিসফিস গালি। আবার মনে পড়ছে নানা স্মৃতি। যেন গোপনে দেখা করার জায়গা ঠিক হচ্ছে, হয়তো প্রেম করা নয়তো মারামারির জন্য। এসব কিছুতেই ফারাজের মন নেই। সে একটা শক্ত চেয়ার আর ভাঙাচোরা ডেস্ক এ বসে আছে যেটা অজস্র লেখা দিয়ে ভর্তি। সে মি. ম্যাকারথির গলা শুনতে পাচ্ছে। তাদের আর্ট টিচার যিনি সর্বোচ্চ চেষ্টা করছেন ক্লাসে শান্তি বজায় রাখতে। কিন্তু সব সময় তর্ক করার জন্য উন্মুখ থাকা টগবগে সব তরুণদের সামলাতে তাকে হিমশিম খেতে হচ্ছে। কিন্তু চারিদিকের এত গণ্ডগোল কিছুই ফারাজের কানে পৌছাচ্ছে না। সে সবটুকু মনোযোগ এক দিকে দিয়ে আছে। সে তার নিজের জগতে বিভোর। যখন ফারাজের মনে হয় যে সে ঠিকভাবে কিছু করতে পারছে তখন এই সময়টা ওর সব চাইতে ভালো লাগে ।
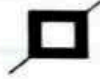
"না ফারাজ না! তুমি ভুল বলছো! আবার বলো!"
তার ইমাম শাকিরের কণ্ঠস্বর মনে পড়লো আর সেই সাথে বাকি বাচ্চাদের চাপা হাসির শব্দ। সবাই হাসি চেপে রাখার চেষ্টা করছে। না হলে হয়তো ইমাম এবার তাদের দাঁড় করাবেন আর লাঠির বাড়ি তাদের উপর এসে পড়বে।
ছয় বছরের ফারাজ একটা লম্বা দম নিলো।
"বি বি বি বিসমিল্লাহির র র র রহমানির র র র রহিম ম ম" সে কাঁদতে কাঁদতে কাঁপা গলায় বললো।

ইমাম শাকির অস্থিরভাবে মাথা নাড়ালেন। "তুমি ঠিকমত পড়াশোনা করো না ফারাজ। তুমি একেবারেই অলস হয়ে গেছো!" ইমাম তার সামনের বেঞ্চে রাখা ছোট্ট লাঠি তুলে নিলেন। "হাত বাড়াও!"
ফারাজ ইমামকে তার দিকে আসতে দেখে ভয় পেয়ে গেলো। পুরো রুম যেন তার সামনে দুলতে লাগলো। গাঢ় সবুজ দেয়াল, লাইট, আরবি আর উর্দু লেখায় ভরা ব্ল্যাকবোর্ড ও একপাশে সাজানো বেঞ্চ যেখানে তার বোন ফারহানা বসে আছে যার মুখ ভাইয়ের জন্য লজ্জায় ছোট হয়ে গেছে। তার পায়ের নিচের সবুজ কার্পেট, জান্নাতের সবুজ রং ও যেন স্বর্গের আবেশ।
তারপর সে দেখলো ইমাম সাহেব তার সামনে দাঁড়িয়ে। তিনি হতাশ মুখে লাঠি উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছেন। ফারাজের হাত কাঁপতে শুরু করেছে কিন্তু সে জানে হাত সরিয়ে নেয়া যাবে না, তাহলে একটা বারি বেশি খেতে হবে।
লাঠিটা বাতাসে উঠে ঠাস করে ফারাজের হাতের তালুতে নেমে এলো। কয়েক মুহূর্তের জন্য যেন অসাড় হয়ে গেলো তার হাত। আর চোখ বেয়ে নেমে এলো আরও কান্না। তবে যতটা ব্যাথায় তার চেয়ে বেশি লজ্জায়। অন্যরা এবার চুপ হয়ে গেছে। তারা ফারাজের ব্যাথা বুঝতে পারছে। ইমামের লাঠির বারি খায়নি এমন কেউ নেই।
"বারবার সূরাগুলো পড়বে। বুঝেছো অলস ছেলে!" ইমাম চেঁচিয়ে বললেন। তিনি রেগে গেছেন। পড়ানো থামিয়ে তাকে আবার এই ছেলেকে নিয়ে সময় নষ্ট করতে হচ্ছে। একে শুধু উচ্চারণ ঠিক করতে হবে। এতটুকুও সে পারছে না। তিনি এর বাবার সাথে কথা বলবেন।
ফারাজ জানে কোনো জায়গায় মানিয়ে নিতে না পারার কষ্ট কতটুকু। সে মাদরাসায় ইমাম শাকিরের কাছে তেমন কিছুই শিখতে পারেনি। তাকে যখনই অনুমতি দেওয়া হয়েছে সে মাদরাসা ছেড়ে চলে এসেছে। তার বাবা ক্রিকেটার ছিলো তাই তিনি চেয়েছেন ছেলেও ক্রিকেটার হোক। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও ফারাজ তার বাবার স্বপ্ন পূরণ করতে পারেনি। সে ব্যাট বা বল কিছুই করতে পারে না। তারপর সে কিছুদিন ফুটবল খেলার চেষ্টা করেছে কিন্তু দুইটা লেফট ফিট নিয়ে ফুটবল খেলা সম্ভব না। সে স্কুলেও

সবার সাথে মিলেমিশে থাকতে চেয়েছে। কিন্তু ফারাজ সবসময়ই অনেক লাজুক ও অল্পতেই কষ্ট পায়। যেসব ছেলে নিজেদের পুরুষালী অবয়বে গড়ে তোলার জন্য মুখের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে ফারাজ সেসব ছেলের চাইতে দেখতে সুন্দর।

কিন্তু আর্ট রুমে তার নিজেকে মানিয়ে নিতে কোন চেষ্টা করতে হয় না। এটা তার নিজের জায়গা। সে বোঝে কোন রং কোথায় দিতে হবে। তার হাতে কাদামাটি জীবন্ত হয়ে যায়। সে তুলিতে গানের সুর তুলতে পারে। এটা তার অভয়ারণ্য।

সে একটা কয়লার টুকরো দিয়ে কাগজে আঁকতে শুরু করলো। তার আঙুল কখনো ধীরে কখনো ক্ষীপ্রগতিতে কাগজের উপর বুলিয়ে যাচ্ছে। সে গভীর মনোযোগ দিয়ে নতুন আকৃতি তৈরি করে গেলো যতক্ষণ না পুরো পাতা ভরে যায়। এবারের এসাইনমেন্ট তার সবচেয়ে প্রিয় ছিলো। কল্পিত ছবি আঁকা। মি. ম্যাকারথি তাদের একটা দৃশ্য কল্পনা করে আঁকতে বলেছিলেন। এটা একটু কঠিন কাজ। কারণ তাদের বেশিরভাগই টাউন সেন্টার ছাড়া শহরের প্রায় কিছুই তেমন দেখেনি।

ফারাজ আঁকার জন্য তার সবচেয়ে পছন্দের জিনিস কয়লা বেছে নিয়েছে। আর যখন তার অন্য ক্লাসমেটরা দুষ্টুমি করে ক্লাস পার করেছে সে তার সবটুকু ঢেলে দিয়েছে ক্যানভাসে।

এই দৃশ্যটা সে গতরাতে স্বপ্নে দেখেছে।

ফারাজ অন্ধকারে দৌড়াচ্ছিলো। কিছু একটা তাকে তাড়া করছিলো। জিনিসটা কী সে জানে না। সে কিছু দেখতেও পাচ্ছিলো না, শুনতেও পারছিলো না। কিন্তু বুঝতে পারছিলো জিনিসটা তাকে ধরার চেষ্টা করছে। সে দৌড়ে পালানোর সময় রাস্তার পাশের লাইটগুলো হঠাৎ জ্বলে উঠে তার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে গেল। আকাশটাও অপরিচিত মনে হচ্ছিলো। মনে হচ্ছিলো যেন মসজিদ, বাড়িঘর সবকিছু ভেসে মিলেমিশে অদ্ভুত এক দৃশ্য তৈরি করেছে। যেন অন্য কোন জগতের অংশ। তার সামনের রাস্তাও উপরে উঠতে লাগলো। আরও উপরে, আরও উপরে। একটা সময় তার মনে হতে লাগলো সে যেন পাহাড়ে উঠছে। সে সামনের কিছু একটা

আঁকড়ে ধরতে চাইলো। সে অন্ধকারে পড়ে যেতে চায় না। অজানা অন্ধকারে।

স্বপ্নের সবটুকুই ফারাজের মনে আছে। আজ তার স্বপ্ন যেন চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠলো। সে যখন ছবি আঁকছিলো তার আশেপাশের সবকিছু যেন ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছিলো। সে দ্রুত ছবি আঁকতে লাগলো, যে কোনও সময় যদি ক্লাস শেষ হয়ে যায়।

যখন ছবি আঁকা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, চোখের সামনে মনের মধ্যে দেখা ছবি ফুটে উঠেছে। তার ছবি আঁকা শেষ হলে সে দেখলো তার চারপাশে ছোটখাটো একটা ভিড় জমে গেছে।

ফারাজ হাতের কয়লা ফেলে চেয়ারে হেলান দিয়ে একটা লম্বা নিশ্বাস ছাড়লো। তার কপাল বেয়ে ঘাম ঝরছে।

তার ক্লাসমেটরা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারা ছবিতে আঁকা দিগন্ত পরীক্ষা করছে। অদ্ভুত ছায়াগুলো বোঝার চেষ্টা করছে। সেখানে দক্ষ হাতের টান স্পষ্ট। অজানা কোন শহরকে যেন অচেনা এক অন্ধকার আকাশ গ্রাস করতে আসছে।

তাদের মধ্যে একটা গুঞ্জন উঠলো। মি. মাকারথিও মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। এই ছেলে ভালোভাবে চেষ্টা করলে অনেক দূর যাবে। ফারাজ তার সবচেয়ে প্রিয় ছাত্র। যদিও অন্য শিক্ষকদের ফারাজকে নিয়ে অনেক অভিযোগ। সে অলস, ঠিকমত পড়াশোনা করে না। আচার আচরণ ঠিক নেই। তারা সবাই নিশ্চিত ফারাজ GCSE তে ফেল করবে। কিন্তু এখানে এই আর্ট ক্লাসে সে অন্যরকম। এখানে যেন সে জীবন্ত হয়ে ওঠে।

কিন্তু পাথরের মত শরীর আর বাঁকা হাসিওয়ালা মাজ নষ্ট করে দিলো অসাধারণ মুহূর্তটা। "তুমি কি একেছো ফারাজ?" সে ভিড় ঠেলে সামনে আসতে আসতে ঠাট্টার স্বরে বললো।

ফারাজ প্রায় জোর করে মাজের চোখের দিকে তাকালো। এক মুহূর্তের জন্য যেন ওর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলো। সে এখনো স্কুলের শেষের সেইদিনের ঘটনা ভুলেনি। তার মা অনেকদিন মুখে মারের দাগ আর কাটা

ঠোঁট নিয়ে হৈ চৈ করেছেন। ফারাজ মাকে শান্তনা দিয়ে বলেছে "স্কুলের একটা ছেলে আম্মাজি। চিন্তার কিছু নেই। আমি সামলে নেবো।"
ফারাজ তার মাকে বলতে পারেনি তাকে মাজ মেরেছে। যার দলের সাথে স্ক্রুজের দলের আজীবন দ্বন্দ্ব। আর এখন সেও এই দলের সদস্য। শত্রুর দলের একটা ছেলে অবশ্যই তারও শত্রু।
ফারাজ চোখ কুঁচকে জবাব দেওয়ার জন্য তাকালো।
"ওহহহ" মাজ মেয়েলি গলায় ঢঙ করে বললো "ফারাজ তাহলে শিল্পী হাহ্?"
ক্লাসের কয়েকজন হেসে ফেললো। মি. ম্যাকারথি কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করলেন। তিনি চশমা ঠিক করতে করতে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু মাজ তাকে সে সুযোগ দিলো না। "কিন্তু আফসোসের বিষয় হচ্ছে কয়লা সহজেই মুছে যায়।" সে এটা বলেই ইচ্ছা করে ছবির উপর হাত দিয়ে ঘষে মসজিদের গম্বুজ ও উঁচু টাওয়ার অন্ধকার আকাশের মধ্যে মিলিয়ে দিতে দিতে বলল "ঠিক এইভাবে।"
পুরো ক্লাসে একটা শিহরণ বয়ে গেলো। মি. ম্যাকারথি অসহায়ভাবে মুখ ঢাকলেন। অস্থির তারুণ্য যা রক্ত ঝরাতে এক মুহূর্ত ভাবে না তার সামনে তিনি কিবা করতে পারেন। তিনি গলা পরিষ্কার করে সাহস নিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য তৈরি হলেন।
ফারাজ তার শিল্পকর্মের দিকে তাকিয়ে রইলো যেটা এখন আর কোনভাবেই ঠিক করা যাবে না। সে বুঝতে পারলো তার মাথা গরম হওয়া শুরু করেছে।
সে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালো। চেয়ারটা তার পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেমেয়েগুলোর গায়ের সাথে ধাক্কা খেয়ে উল্টে পড়ে গেলো।
"মাজ তোমার সমস্যা কি? তুমি কি প্রমাণ করতে চাও?"
মাজ অবজ্ঞাভরে ফারাজকে দেখতে লাগলো। "প্রমাণ করতে চাই যে তুমি কিচ্ছু না। কোনদিন কিছু ছিলে না। কোনদিন হবেও না। যার সাথেই তুমি ঘোরো না কেন। স্ক্রুজ তোমাকে এখানে বাঁচাতে আসবে না।"

ফারাজ অদৃশ্যভাবে, লুকিয়ে ও মাথা নিচু করে তার চলার দিনগুলোর কথা ভাবলো। কীভাবে অন্যরা তাকে ক্ষ্যাপাতো তোতলানোর জন্য। তার বাবার ছোট্ট পত্রিকার দোকানের জন্য। এবং তার সুন্দর সবুজ চোখের জন্য। আর সে কখনো প্রতিবাদ করতে পারতো না।

কিন্তু এগুলো পুরনো দিনের কথা। এখন সে বড় ও শক্তিশালী। আগের মত অত্যাচার সে এখন সহ্য করবে না। সে এখন স্ক্রুজের দলের লোক।

"আচ্ছা? তুমি দেখতে চাও?" সে কঠিন চোখে মাজের দিকে তাকিয়ে বললো। যে ভয় তার মনকে সংকুচিত করে রেখেছে তার সামনাসামনি হওয়ার সময় চলে এসেছে। আর তার পরের মুহূর্তেই ফারাজ তার ব্যাগ হাতে নিয়ে সবাইকে ঠেলে বাইরে চলে গেল। ছুটির ঘণ্টার ঝনঝনানি হঠাৎ নিঃস্তব্ধ হয়ে যাওয়া আর্ট রুম কাঁপিয়ে দিলো।

ষষ্ঠ অধ্যায়
মালিক

ফারহানা মাথার উপর স্কুল ব্যাগ নিয়ে এক দৌড়ে রাস্তা পার হলো। তার পুরো স্কার্ট ভিজে জবজবে হয়ে গেছে। সে তাদের নড়বড়ে গেট পার হয়ে কাদা মাখা বাগানের পথ দিয়ে খোলা দরজার সামনে পৌছালো। ফারহানা দরজার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। তার গা বেয়ে টপটপ করে পানি ঝরছে। রান্নাঘর থেকে আসা রসুন আর শুকনো মরিচ পোড়ার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। আর সেই সাথে গরম তেলের হিসসসস শব্দ। আম্মাজি নিশ্চয়ই সমুচা বানাচ্ছেন।

সে আরও কিছু মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো। সাজেদা ফুফুর চিকন আর দাদীর খসখসে গলার হাসির শব্দ ভেসে আসছে। রমজান তাহলে বেশি দূরে নেই। সমুচা, পাকোড়া ও রুটি বানিয়ে ফ্রিজে রাখার সময় চলে এসেছে।

আম্মাজি যদিও এই পরিবারের ছেলের বউ, কিন্তু আত্নীয় স্বজন ফারহানাদের বাড়িতে আসতেই বেশি ভালোবাসে। কারণ তাদের বড় রান্নাঘর আর সেখানের চায়ের সাথে গল্পের কোনও তুলনা নেই।

"আসসালামু আলাইকুম আম্মাজি!" ফারহানা জানতো কেউ তার আসার শব্দ পায়নি।

কিছুক্ষণ সবার সাথে সালাম বিনিময় চললো। আম্মাজি এপ্রোনে আটামাখা হাত মুছতে মুছতে রান্নাঘর থেকে ছুটে আসলেন। তার এলোমেলো চুল খোঁপা থেকে বের হয়ে আসছে। মুখে আটা লেগে আছে। কিন্তু তারপরও ফারহানার কাছে তার মাকে অসম্ভব সুন্দর লাগছে। চুয়াল্লিশ বছর বয়সেও তিনি এত সুন্দর কীভাবে আছেন!

"ওহ্ তোমার একি অবস্থা হয়েছে!" তিনি ফারহানার ব্যাগ নিতে নিতে বললেন। "একেবারে ভিজে গেছো! তাড়াতাড়ি কাপড় বদলে গরম পানি দিয়ে গোসল করে নিচে আসো। তোমার সাজেদা ফুফু তোমাকে দেখার জন্য অস্থির হয়ে আছেন!"

ফারহানা ভেজা জুতা খুলে মায়ের হাতে দিতে দিতে হেসে মাথা নাড়লো।
"আমি একটু পরেই আসছি আম্মাজি।" সে বললো।
"ইনশাআল্লাহ্" আম্মাজি বললেন।
ফারহানা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে দেখলো তার ফোন বেজে উঠছে। সে ব্যাগ থেকে ফোন বের করে নাম্বারটা দেখলো। ফারহানা দাঁত চেপে ফোন কেটে বন্ধ করে দিলো।
ও কি কখনও ফোন দেওয়া বন্ধ করবে না?
মালিকের সাথে আর কোনও সম্পর্ক রাখবে না। এই ব্যাপারে ফারহানা নিশ্চিত। কয়েকমাস অনেক পাগলামি করা হয়েছে। ফারহানা জানতো এই সম্পর্ক কান্নাকাটি দিয়েই শেষ হবে। কিন্তু মালিক পাশের স্কুলের এশিয়ান ছেলেদের মধ্যে সব চাইতে সুদর্শন। কোন মেয়ে পারবে ওকে না বলতে? মালিক একদম বলিউডের নায়কদের মত দেখতে। ঘন কালো চুল, বাদামি চোখ, কাটাকাটা মুখের গড়ন, গলে যাওয়া চকলেটের মত স্নিগ্ধ ও গাঢ় কণ্ঠস্বর।
ওদের দুজনের প্রথম চোখাচোখি হয় ইন্টারস্কুল বিতর্ক প্রতিযোগিতায়। ফারহানার হার্টবিট বেড়ে গিয়েছিলো। কিন্তু সে সাথে সাথেই অন্য দিকে চোখ ঘুরিয়ে নেয়। সে মালিককে তার ভালো লাগা বুঝতে দিতে চায়নি। কিন্তু বিতর্কের মাঝপথেই একজনের আরেকজনের দিকে নজর পড়ে। এই বিতর্ক প্রতিযোগিতার জন্য ফারহানা অনেক ভালো প্রস্তুতি নিয়ে এসেছিলো। ওর শক্তিশালী যুক্তি আর বাকপটুতা বিপক্ষ দলকে পুরোপুরি ধ্বসিয়ে দিয়েছিলো। আর তখনই ফারহানা মালিকের চোখে নিজের জন্য মুগ্ধতা আর কৌতুহল দেখেছে। ওর চোখে আরও কিছু ছিলো যেটা ফারহানা অনেক চেষ্টা করেও বুঝতে পারেনি। ফারাহানা আবার গর্বের সাথে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। সেদিন বাসে বাড়ি ফেরার পথে অন্য মেয়েরা যখন মালিককে নিয়ে কথা বলছিলো, তখন শুধু ফারহানা চুপচাপ বসে ছিলো। মালিক সবার চোখে পড়ার মত সুন্দর ও বুদ্ধিমান। রবিনা তো সাথে সাথেই ঘোষণা দিয়ে দেয় মালিক তার। সে নিজে নিজে মালিকের সব তথ্য খুঁজে বের করেছে। মালিক কোথায় থাকে, কাদের সাথে মেশে,

ওর কাছের বন্ধু কারা এবং প্রেম করে কি না। রবিনা অনেক চেষ্টা করে মালিকের ফোন নাম্বারও যোগাড় করে ফেলে। কিন্তু রবিনা যত বারই দেখা করতে চেয়েছে, ওর বোনের পার্টিতে আসতে বলেছে মালিক কখনও রাজি হয়নি। মালিকের সব আগ্রহ ছিলো ফারহানার দিকে।

আর এর পরেই সব শুরু হয়। টেক্সট মেসেজ, গোপনে ফোন করা, ই-মেইল ইত্যাদি। মালিক নাছোড়বান্দার মত ফারহানাকে রাজি করানোর জন্য পিছনে লেগেছিলো আর ফারহানাও সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে অন্য সব ছেলেদের মত তাকেও দূরে রাখতে।

ফারহানা বোকা না। সে জানে ছেলেরা কি চায়। বিশেষ করে মালিকের মত ছেলেরা। আর কিছু জিনিস আছে যেগুলো অনেক মূল্যবান। এগুলো নিয়ে কখনও জুয়া খেলা যায় না। তুমি একবার হারালে পরে হা হুতাশ করলেও ফিরে পাবে না। তার মা তাকে খুব ভালোভাবে এই জিনিসটা বুঝিয়ে দিয়েছে। তাই ফারহানা মালিককে ফিরিয়ে দিয়েছে। বারবার ফিরিয়ে দিয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত ওর নিজের তৈরি দেয়াল ভেঙে না গেছে।

মালিকের সব কথা এত সুন্দর ছিলো যে ফারহানা তার বাবা মায়ের সব নিষেধ, দুশ্চিন্তা এক নিমিষে ভুলে গেছে। বিয়ের আগে কোনও ছেলের সাথে কথা বলা যাবে না। কিন্তু তার বয়সে তো আর বিয়ে সম্ভব না। তাই ফারহানা মালিকের কথা তার মাকে কখনও বলেনি। মালিকের নিজের টাকায় কেনা উপহারও সে সবসময় লুকিয়ে রেখেছে। সে তার মায়ের কাছে তার সুন্দর স্বপ্নগুলোর কথাও বলতে পারেনি। সারা জীবন সুখে থাকার স্বপ্ন। সে বলতে পারেনি মাঝে মাঝে বইখাতা খুলে শুধুমাত্র মালিকের কণ্ঠস্বরের কথা মনে করে সে পড়ায় মন বসাতে পারে না।

“আসলে কি জানো সাজ” ফারহানা বিশ্বাসের সাথে বলেছিলো “ও অন্য সব ছেলেদের মত না। আমরা কথা বলি। আমরা সবকিছু নিয়ে কথা বলি। অন্য সবার মত ও শুধু আমার চেহারার জন্য আমাকে পছন্দ করে না। ও আসলেই আমাকে জানতে চায় ও বুঝতে চায়।”

“হয়তো বা” সাজিয়া দৃঢ়ভাবে বলেছিলো “কিন্তু আমার কাছে এখনও মনে হয় একটা মুসলিম ছেলে যে অন্য একটা মুসলিম মেয়ের সাথে প্রেম করতে

চায় তার কিছু সমস্যা তো আছেই। মানে এই সম্পর্কে থেকে সে কি চায়? সে যদি অন্যদের মত হয় আর আশা করে আছে তুমি তার সাথে গভীর সম্পর্কে জড়াবে তাহলে তো তার চরিত্র ভালো না। এই ধরণের মানুষকে আমি একেবারেই সম্মান করি না। আর সে যদি অন্যদের মত না হয় তাহলে এমন সম্পর্কে তার জড়ানোর কী দরকার যেটা ধর্মে নিষিদ্ধ? আর এটা থেকেই কি বোঝা যায় না সে তোমার ব্যাপারে কী ভাবে?"

"সবাই তোমার মত না সাজিয়া" ফারহানা জবাব দিয়েছিলো "কিছু মানুষ জানে কোনটা ঠিক কোনটা ভুল কিন্তু তারপরও তারা সব মেনে চলতে পারে না। আমি বিশ্বাস করি না মালিক অন্যদের মত।"

"আমার শুধু মনে হয় তোমার জায়গায় থাকলে আমি এরকম ঝুঁকি নিতাম না। তুমি তো জানো তোমার বাবা মা একবার বুঝে গেলে কী হবে?"

"হ্যাঁ" ফারহানা ফিসফিস করে বলেছিলো। "আমি জানি।"

তারপরে ফারহানা মালিকের কোনও কথা সাজিয়াকে বলেনি। ততদিনে মালিকের জন্য সে সব ধরণের ঝুঁকি নিতে তৈরি ছিলো। সব ধরনের। যতদিন না মালিক ফারহানার কল্পনার বাইরে কিছু করে ফেলে। সে খবরটা প্রথমে রবিনার কাছে পায়। সে মালিককে এশিয়ান গার্লের পার্টিতে আম্বা নামের লম্বা এক জুনিয়র মডেলের সাথে দেখেছে। আর রবিনার ভাষ্যমতে আম্বা খুব বেশি সুবিধার মেয়ে না।

আর তারপরেই ফারহানার কষ্টের দিন শুরু হলো। চোখের পানিতে বালিশ ভিজিয়ে ফেলেছে। কত নির্ঘুম রাত পার হয়েছে। সব উপহারও ফেলে দিয়েছে। আর মালিককে কিছু না বলেই ওর সাথে সব রকম যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছে।

তুমি কাকে বোকা বানাচ্ছিলে? সে নিজেকে জিজ্ঞাসা করেছিলো। তোমার চাইতে দশগুণ সুন্দর মেয়েরা সব সময় ওর পিছনে ঘুর ঘুর করে। ওর জন্য সব কিছু করতে রাজি। আর ও তোমার সাথে থাকবে?

"সবার চাইতে আমার নিজের উপর রাগ হচ্ছে।" ফারহানা সাজিয়াকে বলেছিলো "আমি ওর জন্য এত ঝুঁকি নিলাম আর তার বদলে আমি কি পেলাম?"

“আমার মনে হয় যা হয়েছে ভালোর জন্যই হয়েছে। তোমার বাবা-মা জানতে পারলে অনেক ঝামেলা হতো। তোমার তো শুকরিয়া আদায় করা উচিৎ যে আরও বড় কিছু হওয়ার আগেই সম্পর্কটা শেষ হয়ে গেছে। মনে রেখো।” সে তার মায়ের মত গলায় বলেছিলো “তুমি তাদের মেয়ে। একটা পাকিস্তানি মেয়ে। একজন মুসলিম। তোমাকে পবিত্র থাকতে হবে। এইসব ফাজলামো মার্কা প্রেম ভালোবাসা থেকে দূরে থাকবে।”
ফারহানা সাজিয়ার কথায় হেসে ফেললেও জানতো প্রত্যেকটা কথা কতোটা ঠিক। তার বাবা মায়ের মতে সে স্কুলে যাবে আর বাড়ি ফিরে আসবে। খোলামেলা কাপড়-চোপড় পরা যাবে না। পার্টির তো প্রশ্নই আসে না। আর বন্ধু-বান্ধবদের বাসায় থাকার কথা তো কল্পনাই করা যায় না।
“আমাদের একটা নিয়মের মধ্যে থাকতে হয় ফারহানা” তার মা বলতো। “আর এটা তোমার ভালোর জন্যই।”
কিন্তু সবকিছু কি উলটো হচ্ছে না? তার চারপাশের সবকিছুই তো অন্যরকম জীবনের কথা বলে। গান, ভিডিও ও ছবি; সব টিন ম্যাগাজিন ভর্তি আছে একই জিনিসে। আর তা হচ্ছে ছেলে, ছেলে আর ছেলে! অবস্থা এমন হয়ে গেছে যে তুমি যদি প্রেম না করো তাহলে তুমি স্বাভাবিক না।
“আমার নিজেকে এত গাধা মনে হচ্ছে।” সে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেছিলো, “তুমি জানো রবিনা আমাকে কি বলেছে? মালিক সবাইকে বলে বেড়াচ্ছিলো সে ‘বরফ কন্যা’ ফারহানা আহমেদকে গলিয়ে ছাড়বে!”
“রবিনার সব কথা বিশ্বাস করার কোনও মানে নেই। তুমি তো জানো ও কি পরিমাণ বানিয়ে বানিয়ে কথা বলে। তাছাড়াও ও নিজেই না মালিকের পিছনে লেগেছিলো?”
“হ্যাঁ কিন্তু মালিক আমাকে পছন্দ করে জানার পরে তো ও সব ভুলে গেছে...”
“তাই নাকি?” সাজিয়া বেশ খানিকক্ষণ ভেবে বললো “ঠিক আছে তাহলে।”
আর তাই ফারহানা নিজেকে আর নিজের বাকি থাকা সম্মানটুকু বাঁচাতে হৃদয়ের সব জানালা তালা মেরে বন্ধ করে দিয়েছে। শুধু মালিকের সাথে

কথা না বললেই সে সব ভুলে যাবে। তাই মালিক যতবারই ফোন করুক না কেন সে কোনমতেই কথা বলবে না।
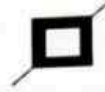
ফারহানা এবার ভেজা স্কুল ড্রেস পাল্টিয়ে তার প্রিয় সালোয়ার-কামিয পরে নিচে নেমে আসলো। ফিরোজা কালারের জামার উপর সোনালি সুতার কাজ। সবাই বলে এটাতে ওর সবুজ চোখ আরো সুন্দর লাগে। আর তাছাড়া এখন জামা-কাপড় নিয়ে দাদীর লেকচার শুনতেও ইচ্ছা করছে না।

রান্নাঘরে সবাই সমুচা বানানোর কাজে সাহায্য করছে। আম্মাজি সমুচার ভিতরে দেওয়ার জন্য মশলা মাখিয়ে পেঁয়াজ রসুন বাদামী না হওয়া পর্যন্ত ভাজছেন। সাজেদা ফুফু তিন কোণা ছোট ছোট রুটির মধ্যে এগুলো ভরে সমান করে মুড়ে একটা কাপড়ের উপর জমা করছেন। আনিসা ফুফু গভীর মনোযোগ দিয়ে সমুচাগুলো ভেজে ভেজে তুলছেন।

ফারহানা রান্নাঘরে ঢুকতেই তারা সবাই ফিরে তাকালেন। তাদের সবার মুখ রান্নাঘরের গরমে লাল হয়ে গেছে কিন্তু মুখে হাসি। ফারহানা সবাইকে সালাম দিয়ে তার ফুফুদের জড়িয়ে ধরলো। দাদীর গালে চুমু দিলো। তারপর একটা চেয়ার টেনে নিয়ে সেও সমুচার মধ্যে মশলা ভরতে লাগলো।

"এভাবে না ফারহানা।" সাজেদা ফুফু ধমক দিয়ে বললেন, "আমাকে দেখো। তোমাকে এইভাবে কোণাগুলো মুড়তে হবে।"

ফারহানাকে যেভাবে বলা হলো সেভাবেই কাজ করে গেলো। রান্নাঘরে সবার কথা মত কাজ করতে সে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এভাবেই তো সে মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে রুটি বানানো শিখেছে।

"ফারহানাকে অনেকদিন পর সালোয়ার-কামিযে দেখলাম উজমা।" আনিসা ফুফু ফারহানাকে ক্ষ্যাপানোর স্বরে বললেন।

"হাহ্" দাদীজি গর্জন করে উঠলেন। "ওর ঐসব বিচ্ছিরি চিপা জিন্সগুলোর চাইতে কামিজ অনেক ভালো।"

"কিন্তু কি আর বলবো" দাদীজি বলে গেলেন, "এখনকার সালোয়ার কামিযের সাথে আমাদের সময়ের কামিজের কোনও মিল নেই। তখনকার কামিজগুলো ছিলো শালীন, ঢিলেঢালা আর শরীরের কোন ভাঁজ বোঝা যেত না। আর এখন মেয়েরা সালোয়ার কামিজ পরলেও মনে হয় সব দেখিয়ে বেড়াচ্ছে!"

"আম্মিজি" সাজেদা ফুফু মায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনি আর বাবাজি আমরা না চাইলেও সবসময় বাড়িতে আমাদের কামিয পরিয়ে রাখতেন।"

"আর সবসময় সাথে ওড়নাও পরতে হতো "ফারহানাকে অনেকদিন পর সালোয়ার-কামিযে দেখলাম উজমা।" আনিসা ফুফু ফারহানাকে ক্ষ্যাপানোর স্বরে বললেন।

"হাহ্" দাদীজি গর্জন করে উঠলেন "ওর ঐসব বিচ্ছিরি চিপা জিন্সগুলোর চাইতে কামিজ অনেক ভালো।"

"কিন্তু কি আর বলবো" দাদীজি বলে গেলেন, "এখনকার সালোয়ার কামিযের সাথে আমাদের সময়ের কামিজের কোনও মিল নেই। তখনকার কামিজগুলো ছিলো শালীন, ঢিলেঢালা আর শরীরের কোন ভাঁজ বোঝা যেত না। আর এখন মেয়েরা সালোয়ার কামিজ পরলেও মনে হয় সব দেখিয়ে বেড়াচ্ছে!"

"আম্মিজি" সাজেদা ফুফু মায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনি আর বাবাজি আমরা না চাইলেও সবসময় বাড়িতে আমাদের কামিয পরিয়ে রাখতেন।"

"আর সব সময় সাথে ওড়নাও পরতে হতো" আনিসা ফুফুও বললেন, "আপনার মনে আছে আমি ওড়না হারিয়ে ফেলতাম বলে আপনি কীভাবে আমাকে মারতেন?"

"তুমি খুবই অগোছালো ছিলে" দাদীজি মেয়ের সামনে হাত নাড়িয়ে বললেন। "আর সালোয়ার-কামিয আমাদের সংস্কৃতির অংশ "ফারহানাকে অনেকদিন পর সালোয়ার-কামিযে দেখলাম উজমা।" আনিসা ফুফু ফারহানাকে ক্ষ্যাপানোর স্বরে বললেন।

"হাহ্" দাদীজি গর্জন করে উঠলেন। "ওর ঐসব বিচ্ছিরি চিপা জিন্সগুলোর চাইতে কামিজ অনেক ভালো।"
"কিন্তু কি আর বলবো" দাদীজি বলে গেলেন, "এখনকার সালোয়ার কামিযের সাথে আমাদের সময়ের কামিজের কোনও মিল নেই। তখনকার কামিজগুলো ছিলো শালীন, ঢিলেঢালা আর শরীরের কোন ভাঁজ বোঝা যেত না। আর এখন মেয়েরা সালোয়ার কামিজ পরলেও মনে হয় সব দেখিয়ে বেড়াচ্ছে!"
"আম্মিজি" সাজেদা ফুফু মায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনি আর বাবাজি আমরা না চাইলেও সবসময় বাড়িতে আমাদের কামিয পরিয়ে রাখতেন।"
"আর সবসময় সাথে ওড়নাও পরতে হতো" আনিসা ফুফুও বললেন, "আপনার মনে আছে আমি ওড়না হারিয়ে ফেলতাম বলে আপনি কীভাবে আমাকে মারতেন?"
"তুমি খুবই অগোছালো ছিলে" দাদীজি মেয়ের সামনে হাত নাড়িয়ে বললেন। "আর সালোয়ার-কামিয আমাদের সংস্কৃতির অংশ ও আমাদের পোশাক। আমরা চাইনি আমাদের মেয়েরা ইংরেজ মেয়েগুলোর মত পোশাক পরুক। স্কুলে ঠিক আছে কিন্তু বাড়িতে না। তোমাদের বাবা কখনোই অনুমতি দিতেন না!"
"ঠিক আছে কিন্তু এখন আমাদের দেখুন" সাজেদা ফুফু তাচ্ছিল্যের সাথে বললেন, "পুরোপুরি ইংরেজ হয়ে গেছি!"
"আমার কিন্তু সালোয়ার কামিজ পরতে অনেক ভালো লাগে" আম্মাজি বলে উঠলেন, "যেমন মার্জিত তেমন আরামদায়ক। আমি তো প্রচুর কিনি।"
"তাতে আমার অনেক সুবিধা হয়। আমিও পরতে পারি" ফারহানা বলে উঠলো। সে সবসময় বড়দের তার ব্যাপারে কথা বলতে শুনতো। খুব কম সময়ই ওনারা তার কাছে কিছু শুনতে চাইতো। এটা একটা দেশিয় প্রথা হয়ে গেছে। একটা এশিয়ান প্রথা। চল্লিশ বছর ধরে ইংল্যান্ডের আলো বাতাসও এই প্রথার কোনও পরিবর্তন করতে পারেনি। যদিও ফারহানার প্রায়ই মনে হয় বড়রা যদি একটু কম কথা বলে ছোটদের কথাও মাঝে

মাঝে শুনতে চাইতেন। সে আবার কিছু একটা বলার জন্য মুখ খুলতেই দরজায় বেল বেজে উঠলো।

"যাও ফারহানা দরজা খুলে দাও" দাদীজি হুকুম দিলেন। "কিন্তু দরজা খোলার আগে পরিচয় জিজ্ঞাসা করে নেবে।"

ফারহানা হেসে উঠে গেলো। তার দাদী বাড়ির মালিকভাব ছাড়তে পারলেন না। ফারহানা পিপ হোল দিয়ে বাইরে দেখে সাথে সাথে দরজা খুলে দিলো।

"নাজমা ফুফু!" হাসিতে তার সারা মুখ ভরে উঠলো।

"আসসালামু আলাইকুম ফারহানা সোনা!"

ফারহানা দরজায় দাঁড়িয়েই ফুফুকে জড়িয়ে ধরলো।

"এবার তাহলে ঘরে ঢুকতে দাও!" নাজমা ফুফু তার লম্বা স্কার্ট তুলে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন।

"আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ।" তিনি রান্নাঘরের সবাইকে একসাথে সালাম দিলেন। অন্যরাও সুর তুলে সালামের উত্তর নিলেন।

নাজমা ফুফু তার ভেজা বুটজুতা খুলতে খুলতেই আম্মাজি আর আনিসা ফুফু রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসলেন। আনিসা ফুফু চোখ কুঁচকে বললেন, "তুমি তো দেখছি বৃষ্টির জন্য তৈরি হয়েই এসেছো।"

নাজমা বড় বোনের দিকে মজা করে চোখ উল্টালো। "হ্যাঁ হ্যাঁ আমি জানি, ইংরেজদের এই জঘন্য আবহাওয়ার জন্য চলো ইসলামকে কিছুক্ষণের জন্য এক পাশে সরিয়ে রাখি।" তিনি বুট হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন।

"ওহ নাজমা!" আম্মাজি ফুফুর হাত থেকে বুট নিয়ে র‍্যাকে রাখতে রাখতে বললেন, "তুমি সব সময় এত বেশি বেশি কেন করো?"

নাজমা কিন্তু ছোট্ট একটা হাসি দিয়ে তার ভাবি আর বোনকে জড়িয়ে ধরলো। আর সবাই যেন সবকিছু ভুলে গেলো।

নাজমা ফুফু তার নেকাব, জিলবাব ও হিজাব খুলে রান্নাঘরে গিয়ে তার বোনকে জড়িয়ে ধরলো। তারপর মায়ের কপালে চুমু দিয়ে পেঁয়াজ কাটতে লেগে গেলো। বাড়ির ছোট মেয়ে হিসাবে এটাই তার ধরাবাঁধা কাজ।

সব সময় এরকমই হয়। ফারহানা ভাবতে লাগলো যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি শেখানো বুলি আওড়াও, আর সব কিছু শেখানো নিয়মে করো ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি ঠিক। কিন্তু নিজের মত করে কাজ করে দেখো কিভাবে সবার ব্যাবহার বদলে যায়।

"তুমি কি এবার আচার বানাবে সাজেদা?"

"ঠিক নেই বাজার থেকে কিনেও আনতে পারি। আমি এত কষ্ট করতে চাচ্ছি না।"

"ধ্যাত তোমাকে কষ্ট করতে হবে! আমি গিয়ে তোমার সাথে আচার বানাবো।"

"জ্বি আচ্ছা আম্মাজি।"

"দোকানের জিনিস ভালো না সাজেদা। তার চাইতে বাসায় বানানোই ভালো।"

"ধন্যবাদ নাজমা। এই জন্যই তো তোমাকে এত ভালোবাসি। তোমার বাগানের কি অবস্থা?"

"মাশাআল্লাহ্, বাগান খুবই ভালো হচ্ছে। তাই না আম্মাজি? প্রচুর টমেটো ধরেছে..."

"ওহ্ হ্যাঁ, ফারহানা তো গত সপ্তাহে অনেকগুলো নিয়ে এসেছিলো। খুবই সুস্বাদু ছিলো!"

"ওগুলো অরগানিক যে এইজন্য।"

"অরগানিক? দাম বাড়ানোর জন্য এইসব ভারী ভারী নাম দেয়। আমরা পাকিস্তানেও এইভাবেই সবজি ফলাই শুধু সাথে এরকম বাড়তি নাম লাগাই না।"

ফারহানা হেসে ফেললো। দাদীজি সবকিছুতে সন্দেহ করেন।

"সমুচা তো সব বানানো শেষ... বাকিরা কখন আসবে?"

"ওরা বলেছে বাচ্চাদের খাইয়ে ৭.৩০ টার দিকে চলে আসবে..."

"আলহামদুলিল্লাহ্, আসমা কি আসছে? বাচ্চা হওয়ার পরে আমি আর ওকে দেখিইনি।"

"ইনশাআল্লাহ, আসমাও আসবে। ইস ছোট্ট উমরকে আবার দেখতে পাবো।"
সবাই মিলে গল্প করতে লাগলো। বন্ধুদের নিয়ে। পরিবার আত্মীয় স্বজন নিয়ে। ছোট ছোট বিষয় কিন্তু সব ভালো গল্প। যেহেতু রমজান প্রায় চলে এসেছে তাই এখন আর "তুমি শুনেছো কি হয়েছে?" কিংবা 'জানো কি সর্বনাশ' ধরনের গল্প আর করা যাবে না। ওনাদের গল্প ফারহানার কানে ঘুমপাড়ানি গানের মত শোনাচ্ছে। তার অবশ্য ভালোই লাগছে। এটা একটা প্রশান্তির জায়গা। পরিবারের সবার সাথে রমজানের প্রস্তুতি নেওয়া। ওইদিন বিকালে বাড়িতে আরও মহিলা বেড়াতে এলো। রমজানের প্রস্তুতি নিতে। চা খেতে আর গল্প করতে। ফারহানার বাবা একটা বাহানা করে দেরি করে অফিস থেকে ফিরলেন। তারপর ফারাজকে নিয়ে মসজিদে চলে গেলেন। কারণ উনি জানতেন বাড়ি ভর্তি মহিলারা থাকবে।
পুরো বাড়িতে উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে পড়েছে। রান্নাঘর খাবার আর মানুষের শরীরের তাপে আরো উষ্ণ হয়ে উঠছে। সবাই যার যার মত হাসিঠাট্টা করছে। উর্দুতে কৌতুক করছে। যদিও বাড়ির বাইরে ইংরেজদের বৃষ্টি পড়ছে। কিন্তু ছোটদের মধ্যে যাদের জন্ম ও বেড়ে ওঠা এই মাটিতে তাদের চোখের সামনে যেন এক টুকরো পাকিস্তান দেখতে পাচ্ছে। একসাথে সামুচা ও পিঠা বানানোর এই অনুষ্ঠান বহুদূরে ফেলে আসা পূর্বপুরুষদের সাথে তাদের কিভাবে যেন এক সুতোয় বেঁধে দেয়।

সপ্তম অধ্যায়

আত্মোন্নয়ন

রমজানের প্রথম রাতে আকাশভরা তারা ছিলো। সারা দেশে ও দেশের সীমানা ছাড়িয়ে মুসলিম পরিবারগুলোতে সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলো। তারা সবাই মসজিদ থেকে চাঁদ ওঠার খবর পেয়ে গেছে। রমজান মাস শুরু হয়েছে। আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবরা সবাই সবাইকে ফোন দিয়ে এই সুসংবাদ জানাচ্ছে। মসজিদ থেকে ঘোষণা দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে আজ রাত থেকে তারাবীহ শুরু হবে। রমজান শেষ হওয়ার আগেই পবিত্র কুরআন খতম দেয়ার জন্য।

ফারাজ গোসল করে পরিস্কার জামা-কাপড় আর মাথায় সাদা টুপি পওে ও গায়ে আতর মেখে বাবার সাথে মসজিদে যাওয়ার জন্য তৈরি হলো। ফারহানাও মসজিদে যেতে চেয়েছে। কিন্তু তার মা বলেছেন বাসায় এখন অনেক কাজ।

"কিন্তু আম্মাজি" ফারহানা তার বাবা আর ভাই বেরিয়ে যাওয়ার আগে প্রতিবাদ করলো, "আমি দেখতে চাই মসজিদে তারাবীহ কেমন হয়।"

"ওটা ছেলেদের জন্য ফারহানা" তার মা তাকে থামিয়ে দিলেন "আমাদের অনেক কাজ পড়ে আছে।"

ফারাজ তার বোনের অন্ধকার মুখের দিকে তাকিয়ে কষ্ট পেলো। "আমি বুঝি না শুধু ছেলেরা কেন সব ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করবে। আর মেয়েরা রান্নাঘরে বসে থাকবে।"

ফারহানার বাবা তার বাধ্য মেয়ের এমন আচরণে অবাক হলেন। "ফারহানা যথেষ্ট হয়েছে। তুমি গিয়ে তোমার মাকে সাহায্য করো। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসবো।"

এরপর বাবা আর ছেলে ঘর থেকে বেরিয়ে বাকি প্রতিবেশিদের নিয়ে একসাথে মসজিদের দিকে রওয়ানা হলো। ফারাজের মনে হলো তার চারিদিকের বাতাস যেন আনন্দে দুলছে। সবাই উৎফুল্ল কণ্ঠে একে অন্যকে

রামাদান মুবারক বলে জড়িয়ে ধরছে। অনেক ছোট ছোট বাচ্চারাও তাদের বাবার হাত ধরে মসজিদে যাচ্ছে। বেশিরভাগের মাথায় সাদা টুপি আর পরনে জিন্সের সাথে পাঞ্জাবি।

কিছু কিছু মুখ সে চিনতে পারলো। এদের সাথে সে মাদরাসায় ও স্কুলে পড়েছে। ওদের মুখ বাবাদের পোশাকের মতই পরিচ্ছন্ন।

দেখেই বোঝা যায় এরা এখনো দুনিয়া দেখেনি ফারাজ ভাবলো। এই বয়সের সবাই সবাইকে চিনলেও বড়দের মত কোলাকুলি বা হাত মেলানোর কিছুই করলো না। মসজিদে ধীরে ধীরে লোক বাড়লে সবাই সারি করে ইমামের পিছনে দাঁড়াতে লাগলো। ফারাজ আর তার বাবা সামনের কাতারে একটা পিলারের পাশে জায়গা পেলো। ওরা যখন বসতে যাবে এমন সময় পিছন থেকে কেউ ডাক দিলো। তারা দুজনেই পিছনে ফিরে দেখলো বাবরি চুল আর মুখভর্তি দাঁড়ি নিয়ে অল্প বয়স্ক এক যুবক তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। ফারাজ একে কখনোই দেখেনি কিন্তু ওর চোখ ছেলেটার আরবি লেখা টি শার্টে আটকে গেলো। লেখাটা একই সাথে আরবি ক্যালিওগ্রাফির আর গ্রাফিতির মত দেখতে।

বাবার মুখ হাসিতে ভরে গেলো। "আহ্ ইমরান আসসালামু আলাইকুম।" তিনি উঠে দাঁড়িয়ে আগুন্তকের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

ইমরান আস্তে করে দুই হাত দিয়ে ফারাজের বাবার সাথে হাত মেলালো। "ওয়ালাইকুম আসসালাম চাচা। আপনার সাথে দেখা হয়ে খুবই ভালো লাগছে।" তারপর সে উজ্জ্বল চোখে ফারাজের দিকে তাকালো। "চাচা এটা কি আপনার ছেলে?"

ফারাজ মাথা নাড়ালো আর সালাম দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলো।

"ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই; কেমন আছো?"

"আমি ভালো আছি" ফারাজ ছোট্ট করে জবাব দিলো।

"আলহামদুলিল্লাহ" ইমরান হেসে বললো।

বাবা ফারাজের দিকে ফিরে বললেন, "ফারাজ ও হচ্ছে ইমরান। ও আমার দোকানে একটা পোস্টার টানানোর জন্য অনুমতি নিতে এসেছিলো। টাউন সেন্টারে কি একটা যেন অনুষ্ঠান ছিলো।"

“হ্যাঁ আর তোমার বাবা রাজিই হচ্ছিলেন না। উনি আমাকে অনেক ঘুরিয়েছেন।” ইমরান হেসে ফেললো। “উনি নিশ্চিত হতে চাচ্ছিলেন যে আমরা কোন রাজনৈতিক সভা করছি না। কিংবা সন্ত্রাসমূলক কাজকর্মে মানুষেকে জড়াচ্ছি না।”

“আমাদের সবসময় সাবধান থাকা উচিত” বাবা ব্যাখ্যা করলেন। ফারাজ বুঝতে পারলো তার বাবা “দায়িত্বশীল বড়মানুষি” কণ্ঠস্বরে কথা বলা শুরু করেছেন। “এখন তো কাউকেই বিশ্বাস করা যায় না। কে কোথায় নজর রাখছে কে জানে। আর অল্পবয়সী ছেলেগুলোর কোন বুদ্ধিসুদ্ধি নেই। নিজেদের মন মত কাজ করে এদেশের মুসলিমদের আরো বিপদে ফেলছে।” বাবার কথার মধ্যেই ইমরান ফারাজের দিকে তাকিয়ে যেন দৃষ্টি দিয়ে বোঝাতে চাইলো “এই বুড়ো মানুষগুলো আর তাদের চিন্তা-ভাবনা এমনই তাই না?”

ফারাজ হাসলো। ইমরানকে তার ভালো মানুষই মনে হচ্ছে। “তো পোস্টারটা কিসের ছিলো?”

“আমাদের একটা মুসলিম আর্ট অর্গানাইজেশন আছে। আর তার পক্ষ থেকে আমরা একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করছি। যাতে মুসলিম যুবকরা আজেবাজে কাজের দিকে না গিয়ে ভালো কিছুর সাথে থাকে।”

ফারাজের চোখের তারা ঝলমল করে উঠলো। সে আরো ভালোভাবে বিষয়টা নিয়ে জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলো। কিন্তু তখনই ইমাম মাইকের সামনে কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করলেন। ইমরান ফারাজকে ইশারায় নামাজের পরে কথা বলার কথা বলে পিছনের সারিতে মিশে গেলো।

“আল্লাহু আকবর!”

তারাবীর নামাজ শুরু হয়ে গেলো।

ফারাজ ইমামের মুখ থেকে সুরেলা কণ্ঠে ভেসে আসা আরবি শব্দের দিকে মনোযোগ দেওয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা করলো। ইমামের কণ্ঠস্বর এবং উচ্চারণের সৌন্দর্য নিয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু বারবার মনে হচ্ছে সে যদি প্রত্যেকটা শব্দের অর্থ জানতো। সে জানে এখন সূরা আল বাকারা পড়া হচ্ছে। কারণ আজ রমজানের প্রথম রাত। আর কুরআনের শুরু

থেকে পড়া শুরু করা হয়। কিন্তু এই সব কিছু আর কয়েকটা পরিচিত শব্দ ছাড়া সে আর কিছু জানে না। মাদরাসায় কুরআন মুখস্থ করে লাভ কি তুমি যদি অর্থ না জানো?

এর কোনও মানে হয় না। সে ভাবলো এরপরে আসলে আমি আগে ইংরেজি অর্থ পড়ে আসবো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সে অর্থ উদ্ধারের চিন্তা বাদ দিয়ে নামাজের সাথে তাল মিলিয়ে পড়ে যেতে লাগলো। জান্নাত-জাহান্নাম, নাজাত ও বিনাশ নিয়ে তেলাওয়াত করার সময় ইমামের গলার আবেগ ফারাজকেও ছুঁয়ে গেলো। যদিও এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তার পা ব্যথা হয়ে গেছে। কিন্তু এই সব কিছুর সাথে যে আত্মার এক সংযোগ স্থাপন হচ্ছে। সে অন্য এক জগতে চলে গেছে। যেখানে সে সারারাত কাটাতে পারবে।

কিন্তু প্রায় একঘণ্টা পরেই ইমাম শেষ সালাম ফিরলেন।

“আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্” ডান কাঁধের দিকে ফিরে একবার বললেন। “আসসালামু আলাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহ্” বাম কাঁধের দিকে ফিরে আর একবার বললেন। আর সালাত শেষ হয়ে গেলো।

কাল থেকে তারা সবাই রোজা রাখা শুরু করবে। তারপর আজকের মত আবার মসজিদে আসবে। তারপরের রাতে, আবার তার পরের রাতে...।

ফারাজ মন থেকে চাইলো সে যেন সারা মাস আসতে পারে।

ক্লান্ত কিন্তু সন্তুষ্ট মনে সে তার বাবার সাথে ভিড় কমার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। যখন সে জুতা পরা শুরু করেছে তখন ইমরান তার পেছনে এসে দাঁড়ালো।

“আসসালামু আলাইকুম ছোট ভাই” সে বললো। তার কণ্ঠস্বর অনেক নিচুতে। নামাজের আগে শোনা গলার চাইতে অনেক বেশি শান্ত। “আমাদের কথা তখন ভালোভাবে শেষ হয়নি। এই যে বিজ্ঞাপনের কাগজ। এখানে আমার ফোন নাম্বার দেওয়া আছে। তুমি যদি এ বিষয়ে আরো জানতে চাও আমাকে ফোন দিতে পারো। অথবা আমাদের ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখতে পারো। ভালো থেকো। ঠিক আছে?”

তারপর সে চলে গেলো।

ফারাজ তার হাতে ধরা কাগজেও ইমরানের টি শার্টে আঁকা আরবি চিহ্ন দেখতে পেলো। সে মনে মনে ঠিক করে ফেললো বাসায় গিয়েই ওয়েবসাইটে ঢুকে দেখবে। বাড়ি ফেরার পথে বাবা ছেলের কেউই কোনও কথা বললো না। যে যার চিন্তায় ব্যস্ত। ফারাজ নাজমা ফুফুর দেওয়া বইয়ের কথা ভাবলো। সে বুঝতে পারছে ফুফু চেয়েছেন সে ইসলামের আরো কাছাকাছি আসুক। আজকে নামাজে দাঁড়িয়ে সে যা অনুভব করেছে এভাবে আর কখনো করেনি।

ফারাজ আর তার বাবা ফিরে এসে সুন্দর গোছানো বাড়িঘর দেখতে পেলো। আম্মাজি ঘুমাতে চলে গেছেন কিন্তু ফারহানা এখনো তার রুমে জেগে বসে আছে। ফারাজ তার বাবাকে শুভরাত্রি জানিয়ে বোনের দরজায় টোকা দিলো। সে দেখলো ফারহানা হাতের উপর মুখ রেখে শুয়ে শুয়ে বই পড়ছে।

"কি অবস্থা আপু" সে চেয়ার টেনে বসতে বসতে বললো।

"হাই" ফারহানা এক পলক তাকিয়ে বললো, "নামাজ কেমন ছিলো?"

"ভালোই" ও জানতো মসজিদে যেতে পারেনি বলে এখনো ফারহানার মন খারাপ। "তুমি আর আম্মাজি বাড়িতে কী কী করলে?"

"কী আর করবো?" ফারহানার গলায় ক্ষোভ। "আমরা খাবারের পর সব জিনিসপত্র পরিষ্কার করে গুছিয়ে রেখে আবার কালকের জন্য খাবার বানিয়ে রেখে দিয়েছি। সবসময় যেমন করি।"

ফারাজ বুঝতে পারছে না তার কী বলা উচিত। ও শুধু ফারহানার কথা শুনে যাচ্ছে। ফারহানা বলতে লাগলো।

"এটা ঠিক না ফারাজ!" ফারহানা প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো কিন্তু তার বাবা মায়ের কানে পৌছায় এতটা জোরেও না। "আমি আমাদের পরিবারে পুরো রমজান জুড়ে মহিলাদের শুধু এগুলোই করতে দেখি। রান্না করা, পরিষ্কার করা; আবার রান্না করা, পরিষ্কার করা! এসবের কোনও মানে আছে? রমজান তো আমাদের জন্যেও। আমাদেরও তো ইবাদাত করা উচিৎ। কিন্তু

তার বদলে আমরা দুনিয়াবি এসব তুচ্ছ জিনিস নিয়ে পড়ে আছি। শুধু খাবার, খাবার, খাবার!"

"আচ্ছা বোন শান্ত হও। জিনিসটা এতটাও খারাপ না। মনে রেখো তুমি এর জন্যেও সওয়াব পাবে।"

"ওহ ফারাজ!" ফারহানা অস্থির গলায় বললো, "তুমি বুঝতে পারছো না। তুমি কখনও বুঝবে না। তুমি ছেলে মানুষ। চাইলেই মসজিদে যেতে পারো। যখন ইচ্ছা বাড়ি ফিরতে পারো। সারাদিন চাইলে কুরআন পড়তে পারো। তুমি কি জানো আম্মাজি কোনদিন মসজিদে তারাবীহ্ পড়তে যাননি? তার সারা জীবনে কোন দিনও না?"

ফারাজ মাথা নাড়ালো। "আম্মাজি সবসময় বলেন আমাদের সমাজে মেয়েরা মসজিদে যায় না... ।"

"উফফ এই এক ফালতু কথা!" ফারহানা রেগে তার হাতের বই ছুঁড়ে ফেললো। "আম্মাজি বাড়ি বসে পনীর বানিয়ে খুশি থাকতে পারেন কিন্তু আমি পারবো না। এই রমজান আমি এভাবে শুধু রান্না-বান্না করে নষ্ট হতে দেব না। আমি প্রতিটা দিন, প্রতিটা মুহূর্ত কাজে লাগাতে চাই।

ফারাজ এই আবেগ বুঝতে পারলো। নাজমা ফুফুর দেওয়া বই পড়ে তার ঠিক এরকমই মনে হয়েছে।

"আর মেয়েরা মসজিদে যেতে পারবে না মানে কি? নাজমা ফুফু সবসময় যান। আমাদের নবীর আমলেও মেয়েরা মসজিদে যেত। তাহলে আমরা কেনো যেতে পারবো না?"

ফারাজ এভাবে কখনও ভেবে দেখেনি। "আমার মনে হয় এটা পাকিস্তানি সংস্কৃতির অংশ না...।"

"আমি তো ভাবতাম আমরা ইসলাম অনুসরণ করি" ফারহানা মুখের উপর থেকে চুল সরালো, "আমি এখন থেকে নাজমা ফুফুর কথা মত চলবো। বাবা মা কি বললেন তাতে আমার কিছু আসে যায় না... "

"ঠিক আছে, ঠিক আছে একটু শান্ত হও। কাল থেকে রোজা রাখা শুরু হবে। এর প্রকৃত অর্থ ভুলে যেও না। ঝগড়া করে মসজিদে গিয়ে কি আসলে কোন লাভ হবে?"

ফারাজ তার বোনের উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছে।
ফারহানার চেহারা পাল্টে গেলো।
"নাহ" সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, "এই সবকিছু এত অসহ্য ফারাজ! আম্মাজি আর আমি মনে হয় যেন যেন দু'টো সম্পূর্ণ আলাদা ভাষায় কথা বলি। উনি কখনও আমাকে বুঝতেই পারেন না...।"
"তোমাকে মনে রাখতে হবে ওনার জন্ম এখানে হয়নি। হয়তো বা এই জন্যই। উনি পাকিস্তানি সংস্কৃতির সাথে বড় হয়েছেন। স্বাভাবিকভাবে শুধু সেটাই বোঝেন আর চান তুমিও একইভাবে বেড়ে ওঠো। তুমি তো জানো তুমি আম্মাজির কতো আদরের ...।"
"না ফারাজ" ফারহানা ভাইকে থামিয়ে দিলো, "আম্মাজি আমাকে ভালোবাসেন ঠিকই কিন্তু তুমি তার কাছে সবচাইতে আদরের। তার সোনার ছেলে!"
"দেখো আমি শুধু জানি বাবা-মাকে কিছু জিনিস বলা যায় আর কিছু জিনিস বলা যায় না। তাদের নিজস্ব চিন্তাধারা আছে। চাওয়া পাওয়া আছে আর তারা সে অনুযায়ী চলেন। তারা আমাদের ভালোবাসেন কিন্তু অবশ্যই তার মানে এই না আমাদের জন্য তারা বদলে যাবেন। তারা ভালো জানেন। যুগে যুগে এভাবেই চলে আসছে।"
"আর অদ্ভুতভাবে আমাদের ইংল্যান্ডে জন্ম হওয়া বেড়ে ওঠা সত্ত্বেও কিছু বদলাবে না? আমার কাছে এই পুরো ব্যাপারটা পাগলামি মনে হয়!"
"কিন্তু আমাদের তো এই পাগলামির মধ্যেই থাকতে হচ্ছে বোন। তুমি জানো আর কোন রাস্তা নেই।"
ফারহানা তার স্কুল আর বাড়ির দুই ধরণের জীবনের কথা ভাবলো। আসলেই তো সে পাগলামির মধ্যে আছে। তারপর সে ফারাজের দিকে তাকিয়ে হালকা একটা হাসি দিয়ে বললো, "নামাজ অনেক সুন্দর ছিলো তাই না?"
ফারাজ হেসে মাথা নাড়ালো।
"হ্যাঁ আমি বুঝতে পারছি। তোমাকে অন্যরকম লাগছে। অন্যদিনের চাইতে শান্ত। মনে হচ্ছে তোমার কোন তাড়া নেই...।"

“ওহ্ আমাকে তো আরবিগুলোর অর্থ জানতে হবে। আর ঘুমানোর আগে বল বৃদ্ধিকারক কিছু একটা খেতে হবে। এত রাকাত নামাজ আসলেই ক্লান্তিকর।”

ওরা দুজনেই হেসে ফেললো। একটু আগে তৈরি হওয়া গুমোট ভাব দূর হয়ে গেলো। তারপর ফারহানা হাই তুলতে তুলতে বললো,” অনেক রাত হয়ে গেছে ফারাজ। আমাদের ঘুমাতে যাওয়া উচিৎ।”

“অবশ্যই, আর কয়েক ঘণ্টা পরেই সাহ্‌রী। শুভরাত্রি!”

ফারহানা চাদরের নিচে ঢুকে টেবিল ল্যাম্পের সুইচে হাত বাড়ালো।

“শুভরাত্রি ফারাজ!”

ফারাজ উঠে দরজার দিকে যেতে যেতে অন্ধকারে সে তার বোনের গলা শুনতে পেলো–

“ফারাজ!”

“হুম?”

“ধন্যবাদ”

“আরে সমস্যা নেই বোন। কোনও সমস্যা নেই।”

সে আস্তে করে দরজা বন্ধ করে চলে গেলো।

অষ্টম অধ্যায়

প্রথম রোজা

সেদিন রাতের পরিষ্কার আকাশ খুব বেশি সময় পরিষ্কার রইলো না। জমজদের মা ওদের সাহ্‌রীর জন্য যখন ডেকে তুলেছেন বাইরে ততক্ষণে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে।

আম্মাজি সবার একঘণ্টা আগেই ঘুম থেকে উঠে গেছেন। তিনি তার সবচেয়ে পছন্দের ধুসর রঙের সোয়েটার আর স্যান্ডেল পরে আগে হিটার অন করে তারপর চুলা জ্বালিয়ে টেবিল সাজাতে লাগলেন। প্রথম রোজার প্রথম সাহ্‌রী।

তার জন্য এই কাজগুলো ভালোবাসার। তার মায়ের জন্যেও এগুলা ভালোবাসাই ছিলো। তাকে পাকিস্তানে সাত জনের পরিবারের জন্য রান্না করতে হতো।

পরিবারের সবাইকে নিজের রান্না করা, ভালো খাবার খেতে দেখার চাইতে আনন্দের কিছু তার জন্য নেই। আর রমজানে এই আনন্দ যেন কয়েকগুণ বেড়ে যায়।

তিনি সব কিছু ভালোভাবে শুরু করার কথা ভাবলেন। প্রথমে পাকোড়া ভাজবেন। পাকোড়া ফারাজের অনেক পছন্দ। আর তাই তিনি শুধু বিশেষ দিনগুলোতেই বানান। তারপর তিনি একে একে ডিম ভাজি, ছোলা সিদ্ধ ও দুধ চা বানানো শুরু করলেন। ফারাজ আর তার বাবা সাহ্‌রীতে ভালোভাবে খাওয়া দাওয়া করতে পছন্দ করে। ফারাজতো নিয়ম করে খাবার খায়, যাতে তার ওজন ঠিক থাকে। সাহ্‌রীর সময় শেষ হওয়ার আগে প্রতিদিন তাকে প্রোটিন শেক খেতে হবেই।

ফারহানা অবশ্য তার মায়ের মত। রোজা রাখার আগেও সে এক বাটি সিরিয়াল আর জুস ছাড়া কিছু খেতে পারে না। সে সবসময় বলে এত সকালে খেতে তার ভালো লাগে না।

আম্মাজি আস্তে আস্তে তার ছেলেমেয়েদের রুমে গিয়ে গিয়ে তাদের ডেকে তুললেন। ওরা আড়মোড়া ভেঙে, হাই তুলতে তুলতে কোন রকমে চোখ

খুলে তাকালো। ওনার মন হঠাৎ করেই বাচ্চাদের জন্য ভালোবাসায় ভরে উঠলো।

"ওঠো বাবা" তিনি মৃদুস্বরে দুজনকেই বললেন, "খাওয়ার সময় হয়ে গেছে।"

প্রথমে পুরো পরিবার নিঃশব্দে খাওয়া শুরু করলো। সবার চোখে ঘুম। আর এত সকালে খাওয়ার অভ্যাস কারো নেই। কিন্তু এই নীরবতার মধ্যেও পারস্পারিক অন্তরঙ্গতা আছে। ওরা জানে আশেপাশের অন্য বাড়ি গুলোতেও সবাই জেগে আছে। এক সাথে সাহ্‌রী খাচ্ছে। পরের দিনের রোজার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

ধীরে ধীরে একসময় সবার ঘুম ঘুম ভাব কেটে গিয়ে উদ্দীপনা দানা বেঁধে উঠতে লাগলো। ফারহানার হাসতে ইচ্ছা করছে। তার অসম্ভব ভালো লাগছিলো। ফারাজকে প্রোটিন শেক বানাতে দেখে সে জোরে হেসে উঠলো। তার ভাই হালকা পাতলা শরীর থেকে কিভাবে এত পেশীবহুল দেহ বানালো; ভাবলেই সে অবাক হয়। মনে হয় যেন চোখের পলকে একদিনে তারা হঠাৎ করে বড় হয়ে গেছে। কিন্তু এখনও ফারাজের চোখ আগের মতই আছে। কোমল আর আবেগ ভরা আর ভূবন ভুলানো হাসি। যদিও সে জানে তার ভাই নিজের কোমলতা পছন্দ করে না। কিন্তু তারপরও ফারহানা চায় ফারাজের সবুজ চোখের সিগ্ধতা আর উজ্জ্বল হাসি কখনো যেন হারিয়ে না যায়।

আমার ছোট্ট ভাই। সে নিজের মনেই হাসলো। ফারাজের চোখ মুখ বিকৃত করে প্রোটিন শেক খাওয়া দেখে ফারহানা আবার হেসে ফেললো। পেশীওয়ালা শরীরের মূল্য তো দিতে হবে তাই না?

কিছুক্ষণ পরেই আজান শুরু হলো। সবাইকে জানিয়ে দেওয়া যে ফজরের সময় হয়ে গেছে। এখন সূর্যাস্ত পর্যন্ত আর কিছু খাওয়া বা পান করা যাবে না। তারা সবাই 'আলহামদুলিল্লাহ্ বলে' নামাজের প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করলো।

ফারহানা আয়নায় নিজের স্কার্ফ পরা মুখ দেখলো। সে বাড়িতে নামাজ পড়ার সময় এটা পরে। তাকে খুব বেশি খারাপ দেখাচ্ছে না।

তারা সবাই সামনের রুমে একসাথে নামাজ পড়লো। আম্মাজি পুরোনো কার্পেটের উপর জায়নামাজ বিছিয়ে দিয়েছেন। খুব কম সময়ই এই বাড়িতে সবার এভাবে একসাথে নামাজ পড়া হয়। ওরা গভীর মনোযোগ দিয়ে বাবার কুরআন তেলাওয়াত শুনলো। তিনি কুরআনের শেষের ছোট ছোট পরিচিত সূরাগুলো পড়ছেন। আর তখন ওরা অবাক হয়ে বুঝতে পারলো বাবাকে ওরা একবছর আগে রমজানে কুরআন পড়তে শুনেছে।

একসাথে নামাজ পড়ার জন্য আমাদের রমজানের জন্য অপেক্ষা কেন করতে হবে? ফারাজ সেজদা দিতে দিতে ভাবলো।

শুধু দুই রাকাত আর সকালের নামাজ শেষ হয়ে গেলো। পুরো পরিবার নিরবে বসে জিকির করতে লাগলো। সুবহানাল্লাহ্, আলহামদুলিল্লাহ্, আল্লাহু আকবর।

ফারহানা ঘড়ির দিকে তাকালো। এখন মাত্র ৫.৩০ মি. বাজে। স্কুলে যাওয়ার আগে বেশ কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নেওয়া যাবে। কিন্তু তার ঘুমাতে ইচ্ছা করছে না। সে ফারাজের দিকে তাকালো। সেও ফারহানার মতই পুরোপুরি জেগে আছে।

কিন্তু আম্মাজি জায়নামাজ ভাঁজ করতে শুরু করছেন। তিনি নামাজের জন্য পরা হিজাবও খুলে ফেললেন। বাবাও উঠে পড়েছেন।

"তুমি কি ঘুমাতে যাচ্ছো বাবা?" ফারহানা জিজ্ঞাসা করলো।

"হ্যাঁ বাবা। আজকে দোকানে অনেক কাজ আছে। তোমরাও যাও ঘুমিয়ে পড়ো, না হলে স্কুলে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে যাবে।

"আমি ঠিক আছি বাবা" ফারাজ বললো, "মা তুমি?"

"আমার কাজ আছে। তুমি তো জানো থালা-বাটি একা একাই পরিষ্কার হয়ে যায় না।"

ফারহানা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। "না আম্মাজি তুমি ঘুমাতে যাও। আমি সব ধুয়ে রাখছি। এমনিতেও আমার ঘুম পাচ্ছে না।"

তার মা অবাক হয়ে তাকালো, "তুমি পারবে ফারহানা? তোমাকে করতে হবে না।"

"আমি পারবো। তুমি গিয়ে বিশ্রাম করো। যাও...।"

একটু পরেই তারা শুনতে পেলো তাদের বাবা মা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছেন।

ফারাজ হেসে তার বোনের দিকে তাকালো, "ভালোই তো বোন! রোজার প্রথম ঘণ্টায়ই সওয়াব জমা করা শুরু হয়ে গেছে?"

ফারহানা হেসে ফেললো। "চিন্তা করো না। আমি একা কাজ করছি না। আমার সাথে রান্নাঘরে আসো!"

ফারাজ আপত্তি করতে চাইলো। কিন্তু ফারহানা টেনে ওকে রান্নাঘরে নিয়ে গেলো।

"তুমি সব কিছু গোছাও। আমি থালা-বাসন ধুচ্ছি।"

"ঠিক আছে" ফারাজ আনাড়ি হাতে কাপ প্লেট এক জায়গায় জড়ো করতে করতে বললো।

ফারহানা কুরআন তেলাওয়াতের ক্লিপ ছেড়ে দিয়ে সিংক এ পানি ভরে সাহ্‌রীতে জমা হওয়া থালা-বাসন ধুতে লাগলো।

ফারাজ তাকে দেখে বললো, "তোমাকে কিন্তু বেশ মানাচ্ছে।"

ফারাজ কিসের কথা বলছে বুঝতে না পেরে ফারহানা ঘুরে তাকালো। তারপর মাথায় হাত দিয়ে সে বুঝলো নামাজের পর এখনও হিজাব খোলা হয়নি। সে লজ্জা পেলো।

"তোমার সত্যি মনে হয়?"

"হ্যাঁ । আমার সবসময়ই মনে হয় মেয়েদের হিজাব পরলে বেশি সুন্দর লাগে।"

"হিজাব কি সুন্দর লাগার জন্য পরা হয়?" ফারহানা পালটা প্রশ্ন করলো। কিন্তু একটু পরেই তার মুখের কঠিন ভাব দূর হয়ে গেলো। "আমি ভাবছি সবসময় হিজাব পরবো।"

"হ্যাঁ বোন শুরু করো। ছেলেগুলোও দূরে থাকবে।"

"ঠিক আছে" ফারহানা চোখ ঘুরিয়ে বললো, "একটা জিনিস নিশ্চিত, আমি হিজাব কোন ছেলের জন্য পরছি না। আমার কাছে এটা খুবই হাস্যকর মনে হয়। তুমি হিজাব পরো বা না পরো ছেলেরা পিছু লাগবেই।"

"তা অবশ্য ঠিক" ফারাজ মৃদু স্বরে বললো। সাজিয়া হিজাব পরা সত্ত্বেও সে নিজেও তো তাকে পছন্দ করে।
"তাছাড়া" ফারহানা বলে গেলো, "আমি যদি হিজাব পরা শুরু করি সেটা শুধুই আমার নিজের সিদ্ধান্ত হবে। অন্যরা কী ভাবলো তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না।"
"আমার মনে হয় না আম্মাজি এতে খুশি হবেন।" ফারাজ ভ্রূ কুঁচকে বললো। যদিও আম্মাজি কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গেলে বড় ওড়না বা চাদর দিয়ে মাথা ঢেকে রাখতেন। জমজরা জানতো তাদের মা ইসলামী কোন পোশাক পছন্দ করেন না। যে ইসলামী পরিবেশে তিনি বড় হয়েছেন সেখানকার সাথে এসব পোশাকের কোন মিল নেই।
ফারাহানা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। "আমি জানি ফারাজ। আম্মাজি আমাকে প্রায়ই বলেন। কিন্তু এই কাজটা আমি নিজের এবং আল্লাহর জন্য করতে চাই। উনি হয়তো বুঝবেন।"
"ইনশাআল্লাহ" ফারাজ অনিশ্চিতভাবে উত্তর দিলো।
তারা দুজনেই চুপ করে রইলো। ফারাজ টেবিল মোছা শেষ করে কুরআনের ইংরেজি অনুবাদ নিয়ে সূরা আল বাকারার অর্থ পড়তে লাগলো। ফারহানাও নিজের কাজ শেষ করে ফারাজের সাথে পড়া শুরু করলো। রান্নাঘরের পর্দার আন্যপাশে ধীরে ধীরে আকাশ আলোকিত হয়ে উঠছে। ভোরের আলো দেখতে পেলো দুই ভাইবোন। একসাথে মাথা লাগিয়ে খাবার টেবিলে বসে গভীর মনোযোগে কুরআন পড়ছে তারা।
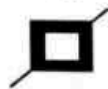
ফারাজ আর ফারহানা কোনভাবে তাদের প্রথম রোজা শেষ করলো। অনেক অল্প ঘুম। কিছুক্ষণ পর পর ডেকে ওঠা পেট আর শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাওয়া গলা নিয়ে তাদের সারাদিন পার হলো।
ফারহানার স্কুলে সাজিয়াসহ অনেক মেয়েই রোজা রেখেছে। এইজন্য অনেকের অভিজ্ঞতা একই রকম ছিলো। লাঞ্চ টাইমে তারা দেখতে পেলো স্কুল কর্তৃপক্ষ মুসলিম মেয়েদের জন্য আলাদা নামাজের জায়গা করে

দিয়েছে। তারা সবাই একসাথে দুপুরের নামাজ পড়লো। ক্ষুধা আর ত্যাগ তাদের এক জায়গায় নিয়ে এসেছে।
কিন্তু ক্ষুধা সত্ত্বেও ওরা হাসিখুশি ছিলো। সবাই মিলে ইফতার, সাহ্রী ও ঈদের দিনের পরিকল্পনা নিয়ে গল্প করতে লাগলো। ফারহানা যখন সাজিয়াকে ফারাজের প্রোটিন শেকের গল্প শোনালো সে হেসে ফেটে পড়লো।
"ফারাজ অনেক বদলে গেছে!" সাজিয়ার এখনো ছোট ফারাজের কথা মনে আছে। তার বেস্ট ফ্রেন্ডের জমজ ভাই। ভিতু ও নরম-সরম। যে দুটো কথা একসাথে বলতে গেলে তোতলাতো।
এখন আর ও আগের মত নেই।
সাজিয়া আর ফারহানা নার্সারি স্কুল থেকে বন্ধু। ওদের বাবা মা একই এলাকায় থাকে। একই মসজিদে নামাজ পড়তে যায়। আর দুই পরিবারের মধ্যে অনেক ভালো সম্পর্ক। সাজিয়ার বাবা মসজিদের ইমাম। এলাকার সবাই তাকে সম্মান করে। আর তাদের পরিবারকেও সবাই ভালো একটা পরিবার হিসাবে জানে। ফারহানার বাবা-মাও এই পরিবারের বন্ধু হতে পেরে খুশি।
"তুমি জানো সাজিয়া?" ফারহানা সবার গল্পের মধ্যেই ধীরে বললো, "আমি জানি না কেন এই রমজানে আমার অন্যরকম অনুভূতি হচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে আমি অনেক বড় কিছু করতে যাচ্ছি। জীবন বদলে দেওয়ার মত কিছু। আমার এর আগে এমন কখনও মনে হয়নি।"
"তুমি তো জানো রোজা কেমন হয়। আমরা প্রাইমারি স্কুল থেকে রোজা রাখছি। এটা এখন জীবনের একটা অংশ।"
"আমি তো সেটাই বলছি সাজিয়া! এই বছর অন্যবারের চাইতে আলাদা। আমি আমার ফুফুর সাথে অনেক বিষয় নিয়ে কথা বলছি।"
"লন্ডনে যে ফুফু থাকতেন উনি? যিনি পর্দা করা শুরু করেছেন?"
"হ্যাঁ আমার নাজমা ফুফু। ওনার সাথে কথা বলে আমি অনেক কিছু নিয়ে ভাবতে শুরু করেছি।"
"আচ্ছা, যেমন?"

“তুমি তো জানো আমি অনেকদিন আগে থেকেই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ছি। কিন্তু আমি আরও অনেক কিছু শিখতে চাই। আর আমি এবার অবশ্যই ভালোভাবে সবগুলো রোজা রাখতে চাই। গতবার আমরা যা করেছিলাম ওগুলো বাদ...।”
সাজিয়া গতবারের কথা মনে করে হেসে ফেললো। তারা কীভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে রেস্টুরেন্টে গিয়েছিলো। আর সবসময় ভয়ে ভয়ে ছিলো। মুসলিম ছেলেগুলো তাদের দেখে ফেলে বাবাকে বলে দেয় কিনা।
ফারহানা আবার বলতে শুরু করলো, “আর আরেকটা কথা; আমি হিজাব পরার কথা ভাবছি। রমজানের জন্য তো অবশ্যই। কিন্তু হয়তো সবসময়ও পরতে পারি।”
সাজিয়া তার বান্ধবির দিকে তাকালো। ওর চোখে আতঙ্ক।
“তুমি এরকম কিছু কেন করবে?” সে মরিয়া হয়ে বললো।
“সাজিয়া!”
“না আসলেই! তুমি কিভাবে ভাবলে ফারহানা আহমেদ? বলিউডের রানী, আমাদের সেকশনে সবচেয়ে হট মেয়ে স্কার্ফ পরবে? তুমি কি ভেবেছো সমাজে তোমার জীবন কেমন হবে? অন্য মেয়েরা কী বলবে? রবিনাই বা কী বলবে?”
“হ্যাঁ আমি এই সব কিছুই ভেবেছি!”
“আমার তা মনে হয় না বান্ধবী! তোমার কি মনে হয়, তুমি আসলেই এমন কিছু করতে পারবে? মালিকের কী হবে? সে কী ভাববে?”
ফারহানার মুখ অন্ধকার হয়ে গেলো। “ওকে নিয়ে কোনও কথা বলবে না। আমাদের মধ্যে আর কিছু নেই। ও কী ভাববে তার উপর নির্ভর করে আমি আমার জীবন চালাতে চাচ্ছি না।”
“মালিক কি আর ফোন করে তোমার কাছে ক্ষমা চায়নি?” সাজিয়া বললো।
ফারহানা মাথা নাড়ালো। তার গাল বেয়ে পানি পড়ছে। তিনমাস পরেও মালিকের কথা ভাবলেই তার কষ্ট হয়।

"আসলে আমি কিছুদিন ধরেই ভাবছি। কিন্তু এখনো পুরোপুরি ঠিক করিনি। আচ্ছা তুমি কিভাবে হিজাব পরে থাকো? তুমি তো সবসময়ই হিজাব পরো তাই না?"

"হ্যাঁ কিন্তু সেটা তো বাবা আমাকে বাধ্য করেছেন তাই " সাজিয়া বিরক্ত স্বরে বললো। "আমাদের বাড়ির সব মেয়েরাই পর্দা করে। জানো তো আমরা ইমামের পরিবার। আমার নিজের অবশ্য মনে হয় না হিজাব পরার দরকার আছে। এমন না যে আমি দেখতে খুবই সুন্দর। তাছাড়া ছেলেদের নিয়ে মাথা ঘামানোর সময়ও আমার নেই।"

ফারহানা মাথা ঝাঁকালো। "তুমি আবার ফালতু কথা শুরু করেছো। তুমি যদি আয়নায় একবার ভালোভাবে দেখতে তুমি কতো সুন্দর!"

"কি একটা চার চোখওয়ালা পাকিস্তানি?" সাজিয়া মুখ ঝামটা দিলো।

"উফফ থামো তো! বুদ্ধিমতি, সুন্দরী ও ধৈর্যশীলা।"

"তৈলমর্দন বন্ধ করো!" সাজিয়া ফারহানার পিঠে চাপড় দিলো, "ওই যে ক্লাসের ঘণ্টা পড়ে গেছে। ওঠো তাড়াতাড়ি!"

ওরা দুইজনে তাড়াতাড়ি ব্যাগ নিয়ে ক্লাসের দিকে দৌড় দিলো। এখন ফারহানার সবচেয়ে প্রিয় ক্লাস হবে। ইংরেজি সাহিত্যের ক্লাস।

◘

ফারাজের অভিজ্ঞতা আরেকটু অন্যরকম ছিলো। তার বোনের মত তার চারপাশে বন্ধুরা ছিলো না। যারা তার পছন্দ অপছন্দ বুঝবে। তার কথা মন দিয়ে শুনবে।

সে অবশ্য লাঞ্চের সময় নামাজের রুমে গেছে। নামাজ পড়তে আর দেখতে, কে কে রোজা রাখছে। নামাজের রুমে অনেকেই ছিলো। তাদের মধ্যে গতরাতে মসজিদে দেখা পরিচিত ছেলেগুলোও আছে। তারা সবাই সবাইকে অল্প কথায় সালাম দিয়ে নামাজ শুরু করলো। বেশিরভাগই নামাজ শেষ করে সোজা বাইরে চলে গেলো। কেউ কেউ কুরআন পড়ার জন্য থেকে গেলো। এরাই ধার্মিকদের মধ্যে পড়ে। সবার থেকে আলাদা।

কিছুক্ষণ পরেই ফারাজ দেখলো নামাজ রুমে শুধু সে একা বসে আছে। এখানে বসে তার ভালো লাগছে। সব গণ্ডগোল থেকে দূরে। কিন্তু একই সাথে একঘেয়েমি চলে আসছে। সে স্কুলব্যাগ হাতড়াতে লাগলো। আর তখনই তার হাতের সাথে একটা দলা পাকানো কাগজ বের হয়ে আসলো। সে কাগজটা খুলে দেখলো। এটা তো ইমরান ভাইয়ের দেওয়া কার্ড। সে দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকালো। সে যদি এক্ষণি যায় আর কম্পিউটার রুম ফাঁকা থাকে,তাহলে হয়তো ক্লাস শুরু হওয়ার আগেই সে ওয়েবসাইটে ঢুকতে পারবে।

ফারাজ ব্যাগ নিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেলো।

কম্পিউটার রুম প্রায় ভর্তি ছিলো। কিন্তু ফারাজ একটা খালি চেয়ার দেখতে পেলো। সে ইন্টারনেটে ঢুকে তাড়াতাড়ি ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেস টাইপ করলো।

সাইট লোড হতে বেশ খানিকক্ষণ সময় লাগলো। কিন্তু ধীরে ধীরে স্ক্রিনে অনেকগুলো ছবি ভেসে উঠলো। ইমরানের টি শার্টে দেখা সেই প্যাঁচানো আরবি লেখা। ফারাজের আগ্রহ আরো বেড়ে গেলো। যখন সে দেখলো সব ছবির একটা স্লাইড শো আছে। বড় বড় শহরের দেয়ালে উজ্জ্বল, অসম্ভব সুন্দর রঙে আঁকা আরবি অক্ষরের গ্রাফিতি। বিভিন্ন গ্যালারিতে বিভিন্ন শিল্পির আঁকা ছবি। একই ধরণের ডিজাইনের টি শার্ট, হুডি।

ফারাজ পড়লো– এটা একটা ইসলামিক আর্ট মুভমেন্ট। যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শিল্পীদের প্রতিভা এবং সৃষ্টিকে এক জায়গায় নিয়ে এসে পরস্পরের সাথে সম্পর্ক স্থাপন।

ফারাজ ভাবলো, সুন্দর চিন্তা তো। আসলেই সুন্দর চিন্তা।

একজন শিল্পীর ছবির দিকে তার বারবার চোখ চলে যাচ্ছে। সে একটা অর্ধেক ছবি দেখলো। এশিয়ান একটা লোক। লম্বা, মুখভর্তি দাঁড়ি আর রাস্তার গুন্ডাদের মত জামা কাপড় পড়া ব্রিমিংগাম সিটি ওয়ালের উপর আঁকা বিশাল এক গ্রাফিতির সামনে স্প্রে ক্যান নিয়ে দাঁড়িতে আছে। গ্রাফিতিতে লেখা সালাম।

এই লোক সারা পৃথিবীতে গ্রাফিতি এঁকেছেন। বিবিসিতে গেছেন। দুবাইতে এক্সিবিশন করেছেন। ফারাজের একটু হিংসা হলো।
এর বাবা-মা এই অদ্ভুত কাজকর্ম দেখে কীভাবে?
তার বাবা সবসময় বলেন, তিনি চান তার পরে যেন ফারাজ নিউজপেপারের দোকান সামলায়। আর ফারাজও তার পরিবারের ইচ্ছা পূরণ করার জন্য তৈরি হচ্ছে। কারণ এমনিতেও সে ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছে না। "না ফারাজ ইউনিভার্সিটি যাওয়া টাইপ ছেলে না" সে তার মায়ের মুখে এই কথাটা বেশ কয়েকবার শুনেছে।
কিন্তু এই মুসলিম ও তার মত দেশি শিল্পীকে দেখে তার নিজেকে নিয়ে আশা জাগছে। এই লোক নিজের আসল পরিচয় না ভুলে, নিজের পছন্দের কাজ করে যাচ্ছেন।
হয় তো বা সবাইকে খুশি করার কোন একটা রাস্তা আছে। হয়তোবা।

নবম অধ্যায়
ইফতার

সন্ধ্যায় ওরা সবাই মিলে দাদীজানের বাড়িতে ইফতার করতে গেলো। বাবার মসজিদ থেকে ফেরার অপেক্ষা করতে করতে আম্মাজি, ফারাজ আর ফারহানা বাড়িতেই খেজুর দিয়ে ইফতার করে ফেলেছে। বাবা রমজানের জন্য আজ তাড়াতাড়ি দোকান বন্ধ করে দিয়েছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা বাইরে গাড়ির শব্দ শুনতে পেলো। আরেক বোতল প্রোটিন শেক শেষ করে ফারাজ তার মা আর বোনকে সাহায্য করলো। তারা গরম গরম পাকোড়া, বিরিয়ানি আর ওদের মায়ের স্পেশাল ভেড়ার মাংসের তরকারির বক্স গাড়িতে তুলছে। আজ সারা বিকাল আম্মাজি আর ফুফুরা ব্যস্ত ছিলেন। আর সবাই যখন দাদীজানের বাড়িতে খাবার নিয়ে পৌছালো তখন একসাথে এত খাবার জড়ো হলো যা দিয়ে আরামসে একটা ছোটোখাটো গ্রামের সবাইকে খাওয়ানো যাবে।

দাদীজী তার স্বামী মারা যাওয়ার পর যে ছোট্ট বাড়িতে আজ পনেরো বছর ধরে আছেন বয়সের ভারে সেটা আজ জরাজীর্ণ হয়ে গেছে। দাদীজানের সাথে এই বাড়িতে তার বোন রাজিয়া থাকেন। তার ছেলে-মেয়ে, ছেলে বৌ ও নাতি-নাতনিসহ সবাই একসাথে থাকে।

সবাইকে সালাম জানানোর পর ফারহানা তার গায়ের কোট খুলে বাড়ির বাকি মহিলাদের সাথে রান্নাঘরে গেলো ছেলেদের খাবার পরিবেশন করতে। তার ছোট ছোট চাচাতো, ফুফাতো ভাই বোনেরা এ ঘর ও ঘর করে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর টুকটাক পাকোড়া, পেঁয়াজু ভাজি তুলে খাচ্ছে। মেয়েরা তাড়াতাড়ি কাজ করতে লাগলো। নিশ্চয়ই বাড়ির পুরুষদের ক্ষুধা লেগে গেছে। কারণ নিচে বাচ্চাদের হৈ চৈ এর সাথে তাদের কণ্ঠস্বর আর শোনা যাচ্ছে না।

ছেলেদের খাবার বেড়ে দিয়ে ফারহানার মা আর ফুফুরা নিজেদের আর বাচ্চাদের জন্য খাবার বাড়তে শুরু করলেন। ফারহানা আর নাজমা ফুফুর

দায়িত্ব ছোটদের সবাইকে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে হাত ধুইয়ে আনা। ওরা যতক্ষণে ফিরলো খাবারের প্লেটে পুরো রুম ভরে গেছে। নাজমা ফুফু আবার রান্নাঘরে ঢুকে গেলেন।

প্রচণ্ড ক্ষুধায় প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাওয়া ফারহানা তার প্রথম লোকমা গালে তুললো।

বিসমিল্লাহ্। সবাই খাওয়া শুরু করলো। পুরো বাড়ি হঠাৎ করেই শান্ত হয়ে গেছে। ফারহানা ভাবতে লাগলো, ইফতারের খাবারের চাইতে সুস্বাদু আর কিছুই হয় না। তার চারপাশে সবার মুখেও একই অনুভূতির ছায়া।

ফারহানা মুগ্ধ হয়ে তার দাদীজান আর দাদীজানের ভাবির দিকে তাকালো। তাদের মেহেদি দেওয়া সাদা চুল ওড়না দিয়ে ঢাকা। সত্তর বছর বয়সেও রোজা রাখছেন। এই বিশাল পরিবারের জন্য রান্না করে যাচ্ছেন।

ফারহানার হৃদয় আনন্দ আর পরিতৃপ্তিতে ভরে উঠলো। সে পেরেছে! সে সারাদিন রোজা রেখেছে! আর তার মনে হচ্ছে সে নিজেকে দেওয়া কথা রাখতে পেরেছে। সে সঠিক পথেই আছে।

মালিক আজ কোন মেসেজ বা ফোন দেয়নি। সেও হয়তো রোজা রেখেছে আর অপরাধবোধের জন্য তাকে ফোন করতে পারেনি। এভাবেই হয়তো একটা সময় আকর্ষণ কমে যাবে।

একটু পরেই ছেলেরা আরও খাবার চাইতে লাগলো। সাজেদা ফুফু আর আম্মাজি খাওয়া ছেড়ে রান্নাঘর থেকে আরও খাবার নিয়ে আসতে উঠে গেলেন। তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে ছেলেরা তারাবীহ্ পড়তে মসজিদে যাবে। মুনির চাচার বউ আসমা চাচী চুলায় বড় এক হাড়ি দুধ বসালেন চা বানানোর জন্য।

"নাজমা কোথায়?" আনিসা ফুফুর স্বামী আলী ফুফা জিজ্ঞাসা করলেন।

আনিসা ফুফু চোখ উল্টিয়ে বললেন, "ওহ্ নাজমা আমাদের সাথে খাবে না। তুমি আর আবিদ এখানে আছো তাই। তোমাদের সাথে ওর রক্তের সম্পর্ক নেই, তাই নাকি নিষেধ আছে।

আলী ফুফা তার বিশাল পেট দুলিয়ে হাসলেন। "ওকে বলো আমি কামড়ে দেবো না!" তারপর তিনি খোলা দরজা দিয়ে চেঁচিয়ে ডাকলেন, "নাজমাজি! আপনি আসতে পারেন। আমি কামড়াই না!"

"আমি জানি আলী ভাই। আমি জানি!" রান্নাঘর থেকে আওয়াজ আসলো। কিন্তু সব পুরুষ মানুষ চলে যাওয়ার আগে নাজমা ফুফু ঘরে ঢুকলেন না। সবাই নামাজে চলে যাওয়ার পর তিনি আবায়া আর স্কার্ফ খুলে বসলেন।

"আসসালামু আলাইকুম সোনা!" নাজমা ফুফু পাটি ভাঁজ করতে করতে বললেন,

"তোমার প্রথম রোজা কেমন ছিলো?"

ফারহানা হেসে বললো, "মাশাআল্লাহ্! বেশ ভালো ছিলো! আমি যা ভেবেছিলাম তার চাইতে অনেক সহজ ছিলো।"

"খুবই ভালো! ফারাজের কী অবস্থা?"

"ফারাজও ভালোভাবে রোজা করেছে" ফারহানা জবাব দিলো। "আমরা ফজরের পর একসাথে কুরআন পড়েছি। সবকিছু বেশ ভালো ছিলো।"

"বাহ্ খুবই ভালো করেছো। মাশাআল্লাহ্!" নাজমা ফুফুর চেহারা আনন্দে ভরে উঠলো। "তোমাদের দুইজনের কথা শুনে খুবই ভালো লাগছে। তুমি কি কাল রাতে তারাবীহ্ পড়েছো?"

ফারহানার মুখ অন্ধকার হয়ে গেলো। "না" সে অভিমানের সুরে বললো, "বাবা আর ফারাজ নামাজ পড়তে গেছে কিন্তু আম্মাজি আমাকে বাসায় থেকে তাকে সাহায্য করতে বলেছেন।"

নাজমা ফুফু ভ্রূ কুঁচকে ফেললেন, "আহ আচ্ছা তাই তো। মসজিদ তো শুধু ছেলেদের জন্য। তাই না?" তার কণ্ঠে বিদ্রুপ। "কিন্তু তুমি বাসায়ও নামাজ পড়তে পারো।"

"হ্যাঁ তা অবশ্য ঠিক। আসলে মসজিদে না যেতে পেরে আমার এত মন খারাপ হয়ে গিয়েছিলো; এরপর থেকে আমি পড়বো।"

"এরপর থেকে তুমি আমার সাথে মসজিদে যেও" নাজমা ফুফু হাতের কাজ শেষ করতে করতে বললেন। "আমি যে মসজিদে যাই সেটা এখান থেকে

মাত্র পঁচিশ মিনিটের পথ। আর ওখানে মেয়েদের জন্য অনেক জায়গা আছে। আর তেলাওয়াতও অনেক সুন্দর।"

"আপনি আমাকে সাথে নেবেন?" ফারাহানার মুখের অন্ধকার দূর হয়ে গেলো।

"তুমি এই সপ্তাহে আমার সাথে ইফতারে আসতে পারো। আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বন্ধু আমাকে দাওয়াত দিয়েছে। আমার মনে হয় তোমার ওকে ভালো লাগবে। তুমি তো আমার কোনও বন্ধুকে চেনো না তাই না?"

"না" ফারহানা জবাব দিলো, "কিন্তু আম্মাজি বলেন আপনার বন্ধুরা সুবিধার মানুষ না। দেখুন আপনাকে কীভাবে বদলে দিয়েছেন!"

ওরা দুজনেই হেসে ফেললো।

"তো তুমি তাহলে আসছো?"

"আমি ঠিক জানি না ফুফু আপনার বন্ধুদের সাথে আমাকে অদ্ভুত লাগবে। ওনারা সবাই তো হিজাব, নেকাব পরে তাই না?"

"তো?" নাজমা ফুফু বললেন, "তাতে কী হয়েছে?"

"আমি চাই না ওনারা আমাকে খারাপ ভাবুক। আমি তো হিজাব পরি না।"

"ধ্যাত, যত্তসব উল্টা-পাল্টা কথা! যে কেউ তোমাকে জানার আগেই খারাপ ভাববে তার অধিকারই নেই তোমাকে জানার। তাছাড়া আমার বন্ধুরা সবাই অনেক ভালো মনের। ওরা কিছুই মনে করবে না।"

"আপনি তাহলে আম্মাজির কাছে অনুমতি নিয়ে দিন। তা না হলে উনি রাজি হবেন না।"

"চিন্তা করো না। আমি ভাবীর সাথে কথা বলবো। তাহলে আমরা একসাথে বের হচ্ছি?"

ফারহানা হাসলো, "হ্যাঁ"

নাজমা ফুফু তার দিকে চোখ টিপে পাশের রুমে বাচ্চারা যে জঞ্জাল বানিয়ে রেখেছে সেগুলো গোছাতে গেলেন। ফারহানাও নিজের মনে হেসে রান্নাঘরে চলে গেলো।

সে রান্নাঘরের দরজার কাছে গিয়ে নিচু কিন্তু তীব্র গলার কথা শুনতে পেলো। তার মায়ের গলা সবচাইতে জোরে শোনা যাচ্ছে, "সবাই জানে নাজমা কেমন স্বার্থপর!"

ফারহানা ঢোকার সাথে সাথে ফিসফিসানি হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেলো। ফারহানার মা কথা বন্ধ করে বাকি থালাবাটিগুলো ধোয়া শুরু করলেন। সাজেদা ফুফু চোখমুখ কুঁচকে মোছামুছি করতে লাগলেন। দাদীজান তার দিকে হেসে তাকালেন। কিন্তু রাজিয়া ফুফু শুন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

সে বুঝতে পারলো সে এসে পড়াতে অনেক জরুরি কোন আলোচনা থেমে গেছে। নাজমা ফুফুকে নিয়ে কোন আলোচনা।

নাজমা ফুফু কী করেছেন?

সেই রাতে ফারাজ আর ফারহানা দুজনেই তারাবীহ্ পড়লো। ফারাজ ইমামের পেছনের সারিতে তার বাবার পাশে দাঁড়িয়ে মানুষের সমুদ্রে তাল মিলিয়ে সেজদা দিলো। আজ সে ইমামের মুখ থেকে আসা সুন্দর কথাগুলোর অর্থ জানে। আজ সকালে সে কুরআনের ইংরেজি অনুবাদ পড়ে এসেছে। যেন প্রত্যেকটা আয়াত তার সাথে কথা বলছে। এমন কখনও হয়নি আগে।

সে মাথা থেকে সব চিন্তা সরিয়ে দিলো। স্কুল, বাড়ি সবকিছুর চিন্তা সে মাথা থেকে তাড়ানোর চেষ্টা করলো। এসব চিন্তা তাকে নামাজে মনোযোগ দিতে দেয় না।

আর যখন সে মসজিদের সবুজ কার্পেটে সেজদায় মাথা রাখলো, সে যেন তার আলাদা জগতে ঢুকে গেলো। সে গভীরভাবে আকুল হয়ে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাইলো। সঠিক পথের দিশা চাইলো। সব কিছু মেনে চলার শক্তি চাইলো।

যখন সে আর বাবা দাদীজানের বাড়িতে ফারহানা আর আম্মাজিকে নিতে আসলো, ফারাজের মনে হলো সে পরিপূর্ণভাবে পবিত্র হয়ে গেছে।

তাহলে এইজন্য মসজিদে যাওয়া ছেলেগুলোর মুখ এত উজ্জ্বল। ফারাজ নিজের মনেই হেসে ফেললো।
সে যেন প্রশান্তি পাচ্ছে।

ফারহানাও নাজমা ফুফুর সাথে তার ঘরে আলো জ্বালিয়ে সালাতুত তারাবীহ্ পড়লো। তার ঘরে আতর আর বইয়ের সুগন্ধ। নাজমা ফুফুর কঠিন কণ্ঠস্বর। তিনি কুরআন তেলাওয়াতের সময় পুরোপুরি বদলে যায়। তিনি ধীরে আর মমতা দিয়ে এমনভাবে কুরআন তেলাওয়াত করেন, যা হৃদয় ছুঁয়ে যায়। ফারহানার চোখ দিয়ে অজান্তেই পানি পড়তে লাগলো। সে আর তার ফুফু কাঁধ মিলিয়ে রুকু সেজদাহ্ দিলো। তারা এত কাছাকাছি ছিলো, যে ফারহানা বুঝতে পারছিলো কিছু কিছু আয়াতে তার ফুফুও কেঁদে ফেলছেন।
ফারহানা তার সামনের পুরো পৃথিবী থেকে আলাদা হয়ে নামাজে ঢুকে গেলো। সে এমনভাবে নামাজ পড়তে লাগলো যেন সে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সে তাকে দেখতে পাচ্ছে ঠিক যেমন তিনি তাকে দেখতে পাচ্ছেন।
নামাজে সে তার অতীতের সব পাপের জন্য ক্ষমা চাইলো। নিজের ইচ্ছা ও অনিচ্ছায় করা সকল পাপের জন্য ক্ষমা। সে তার সর্বস্ব পরিতাপের জন্য ঢেলে দিলো। আর যখন সে নামাজ শেষ করলো, তার মনে হলো নামাজ তাকে পবিত্র করে সামনে আগানোর জন্য প্রস্তুত করে দিয়েছে।
বাড়ি ফেরার পথে জমজরা পাশাপাশি গাড়িতে বসেছিলো। তাদের মুখে কিছু বলতে হয়নি। তারা দুজনেই জানতো আজকের রাত তাদের জীবন অন্যদিকে নিয়ে যাবে।

দশম অধ্যায়
হিজাব

পরের দিন সকালে বাইরে বেরিয়ে ফারহানা প্রথম যে জিনিসটা খেয়াল করলো, সেটা হচ্ছে তার কানে অন্যদিনের মত ঠাণ্ডা লাগছে না। আজ ফারাজের দেরি হয়ে গেছে। তাই ফারহানা একাই স্কুলে যাচ্ছে। আজ ও তাড়াতাড়ি স্কুলে পৌছাতে চায়। ফারহানার সাদা হিজাব ওর মুখের চারপাশে আটকানো। চুলগুলোকে সুন্দরভাবে ঢেকে রেখেছে। সে অনেক রকমভাবে হিজাব বেঁধে দেখেছে। অবশেষে পুরো কপাল ঢেকে স্কার্ফ পরে এসেছে। এটা ওর মুখের সাথে বেশ মানানসই। আর অদ্ভুতভাবে থুতনির উপরের টোলটা দেখতে আরো সুন্দর লাগছে।

তোমার সব চেষ্টা বিফল ফারহানা। সে নিজেকে বললো। ওর নিজেকে অপরাধী লাগছে। হিজাব তো সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য নয়। এটাতো নতুন কোন হ্যাট বা গয়না না। এটা ইবাদাতের অংশ। আর এটাই সে সকালে আম্মাজিকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে। ফারাজ আর আব্বা তাকে তখনো দেখেনি। তাকে দেখার সাথে সাথে আম্মাজি কঠিন স্বরে বলেছেন, "ফারহানা! তুমি এমন পোশাক কেন পরেছো?"

মায়ের এতটা অবাক হয়ে যাওয়া দেখে ফারহানা প্রায় হেসে ফেলেছিলো।

"কেমন পোশাক আম্মাজি?" ফারহানা যতোটা সম্ভব গলা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করলো। যদিও তার মায়ের চোখে মুখে আতঙ্কিত ভাব একদম ভালো লাগছে না।

"কেমন পোশাক!" আম্মাজি প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, "এটা তো তোমার স্কুল ড্রেসের অংশ না তাই না? তুমি কি করতে চাইছো? তুমি কি চাও তোমার জন্য স্কুলে তোমার বাবাকে ঝামেলায় পড়তে হোক? সবাইকে দেখাতে চাচ্ছো তুমি কতটা ধার্মিক?"

বাস স্ট্যান্ডে ফারহানাকে চিনতে পেরে সাজিয়া চিৎকার করে উঠলো "ইয়া আল্লাহ্! আমি বিশ্বাস করতে পারছি না তুমি আসলেই হিজাব পরেছো! তোমার কেমন লাগছে?"
ফারহানা হেসে বললো, "উষ্ণ!"
ওরা দুজনেই হাসতে লাগলো
"তোমার মা কি তোমাকে এই অবস্থায় দেখেছেন?"
ফারহানা মাথা নাড়ালো।
"তো উনি কী বললেন?"
"শুধু এতটুকু শুনে রাখো উনি খুশি হননি....।"
শুধু খুশি হয়নি বললে তো অনেক কম বলা হয়।
"কিন্তু সত্যি বলতে আমার খুবই ভালো লাগছে। আমার মনে হচ্ছে এটা সঠিক সময়ে একটা সঠিক সিদ্ধান্ত। আমাকে কি অদ্ভুত দেখাচ্ছে?"
"উমম" সাজিয়া তার বান্ধবীকে ভালোভাবে আগাগোড়া দেখে বললো, "আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে তোমাকে হিজাবে মানিয়েছে। কিছু মেয়েকে দেখতে খারাপ লাগে। কিন্তু তোমাকে অনেক সুন্দর লাগছে। আর সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হলো তোমার চোখ দুটো আরো বড় লাগছে।"
"দেখো আমি ফারাজকে বলেছি যে, আমি হিজাব সুন্দর লাগার জন্য পরছি না। পর্দা মন থেকে করতে হবে। না হলে তার মূল্য কী বলো?"
"তোমার ইচ্ছা অনিচ্ছার উপরও তো অনেক কিছু নির্ভর করে।" সাজিয়া প্রায় ফিসফিসিয়ে বললো।
"তুমি কী বলতে চাচ্ছো সাজিয়া?"
"দেখো ফারহানা! আমি তোমাকে আগেও বলেছি। আমি স্কার্ফ পরি, কারণ আমার বাবা আমাকে স্কার্ফ ছাড়া কখোনোই বাইরে যেতে দেবেন না। ওনার মতে মুসলিম মেয়েদের হিজাব পরতে হয়, তাই তুমি পরবে। ব্যাস কাহিনী শেষ। আমি জানি উনি ঠিক কথাই বলছেন। কিন্তু তারপরও আমার বাবা কখনও আমার মতামত জানতে চাননি।"
"কিন্তু তুমি যেটা করছো সেটা তো আমার অনেক আগেই করা উচিৎ ছিলো।"

"হ্যাঁ ঠিক আছে। কিন্তু আমাদের দুইজনের ব্যাপার আলাদা। ছেলেদের কাছে নিজের সৌন্দর্যের প্রশংসা শোনার ভাগ্য আমার কখনও হয়তো হবে না...।"

ফারহানা মাথা নিচু করে ফেললো। মালিকের জন্য সে কতোই না চোখের পানি ফেলেছে। "বিশ্বাস করো সাজ। এসব এতটাও আফসোস করার মত জিনিস না। একেবারেই না। মাঝে মাঝে আমার তোমাকে হিংসা হয়। তুমি এই সব ফালতু জিনিস থেকে দূরে আছো। এইসব বাজে জিনিস, যেগুলো থেকে আমাদের সব সময় দূরে থাকা উচিত। আমি এখন বুঝতে পারছি। আমার মনে হয় তোমার হিজাব পরার কারণ নিয়ে ভালোভাবে ভাবা উচিৎ। জীবনটা তোমার, আর এই সুযোগ তুমি একবারই পাবে।"

"হ্যাঁ হয়তো বা। কিন্তু তারপরও... কেউ একজন যদি থাকতো, যে আমার মধ্যে বিশেষ কিছু দেখবে। যাই হোক বাস্তবতা তো অন্যরকম। চলো বাস চলে এসেছে।" ওরা দুজনে বাসে উঠে গেলো। রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসা ফারাজকে দুজনের কেউই দেখতে পেলো না। ফারাজের চোখের সামনে ওরা বাসে উঠে গেলো।

প্রথম দিন হিজাব পরার অভিজ্ঞতা ফারহানার জন্য অদ্ভুত ছিলো। একদিকে তার খুবই ভালো লাগছিলো। অবশেষে সে সাহস করে হিজাব পরে বাইরে আসতে পেরেছে। অনেকেই তাকে অভিনন্দন জানিয়েছে। তার কাছে জিজ্ঞাসা করেছে সে কীভাবে এত সুন্দর করে হিজাব বাঁধা শিখলো? তার কেমন লাগছে? এরা সবাই ধার্মিক মেয়ে, শান্ত ও ভদ্র। ওরা স্কুলের বেশিরভাগ অনুষ্ঠানে আসতে পারে না। প্রায় সবাই ওদের এড়িয়ে চলে। ফারহানা ওদের মত হতে চায় না। কিন্তু ওদের গভীর বিশ্বাসকে আর সুন্দর স্বভাবকে সম্মান করে। ও চেষ্টা করবে এই মেয়েগুলোর সাথে আরেকটু বেশি সময় কাটাতে।

অন্যদিকে ফারহানাকে অনেকের অদ্ভুতভাবে তাকানো আর বাজে মন্তব্য সহ্য করতে হলো। রবিনা তো প্রথমেই চোখ কপালে তুলে ফেললো। তাচ্ছিল্যের সুরে বললো, "তুমিও শুরু করেছো ফারহানা! আমি জানি তুমি তোমার ওই ফুফুর সাথে একটু বেশিই ঘুরছো। কিন্তু এসব বাড়াবাড়ির কি

দরকার!" রবিনার কথা শুনে ওর সাথে থাকা মেয়েগুলো হেসে ফেললো। "বুঝলাম মালিক তোমাকে ছ্যাঁকা দিয়েছে। তার মানে এই না; তোমাকে পুরো ইসলামী হয়ে যেতে হবে।"
একপাশ থেকে কেউ একজন বলে উঠলো, "উফফ রবিনা এই কথাটা বলার কি খুব দরকার ছিলো?"
ফারহানা রবিনার দিকে তাকালো। সে মনে মনে ভাবলো, আমি এই মেয়েগুলোর সাথে কেন বন্ধুত্ব রেখেছি। তারপর সে নিজের জায়গায় বসে বললো, "ভালোভাবে শুনে রাখো। আমি হিজাব নিজের ইচ্ছাতে পরছি। অন্য কিছুর সাথে বা কারোর সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। বুঝেছো?"
একজন ইংরেজ মেয়ে কারলা হঠাৎ বলে উঠলো, "আমার কাছে তো তোমাকে খুবই সুন্দর লাগছে ফারহানা। আমি জানি এই সিদ্ধান্তটা তোমার জন্য সহজ ছিলো না।"
ফারহানা একটা ধন্যবাদসূচক হাসি দিলো।
"কিন্তু কেন ফারহানা?" একজন মুসলিম মেয়ে জিজ্ঞাসা করলো, "এখন রমজান মাস তাই?"
"সত্যি কথা বলতে কি, আমি অনেকদিন থেকেই হিজাব পরার কথা ভাবছি। আর আমার মনে হয় এখন আমি পুরোপুরি তৈরী।"
"সমাজ থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার জন্য তৈরী?" রবিনা টিটকারি দিলো। "দেখো ফারহানা তোমার জীবনে সবকিছু কতো সুন্দরভাবে চলছিলো। খামোখা এই সবকিছু তুমি কেন ছেড়ে দিতে চাইছো? যাতে লোকে মনে করে তুমি ধার্মিক? আমার বোনের মতে, স্কার্ফ পরা মেয়েগুলোর মনে বেশি দোষ। এরা চায় দুনিয়ার সবাই এদের ভালো মেয়ে মনে করুক। কিন্তু ভিতরে ভিতরে ঠিকই সব রকম বাজে কাজ করে বেড়ায়। তুমি যদি ভালো মেয়ে, ভালো মেয়ে খেলতে চাও তো খেলো। কিন্তু মনে রেখো, অন্যদের ভাবনাকে তোয়াক্কা না করে নিজের মনের মত কাজ করতে অনেক সাহস লাগে।"
"তোমার বোন তোমাকে এসব বলেছে?" ফারহানা জিজ্ঞাসা করলো।

"হ্যাঁ, আমার বোন এসব খুব ভালোভাবে জানে। ও নিজের ইচ্ছামত কাজ করে। সমাজ কী ভাবলো এগুলোকে একদম পাত্তা দেয় না। মানুষের কথা ভেবে আমি নিজের জীবন চালাতে পারবো না। জীবন অনেক ছোট। তাই না?"

"হ্যাঁ একদম" রবিনার বান্ধবীরা সবাই একসাথে গলা মেলালো। কিন্তু বাকি মেয়েরা সবাই চুপ হয়ে গেছে।

ফারহানার মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে। ওর মনে হচ্ছে রবিনাকে দুইহাতে ধরে একটা জোরে ঝাঁকি দিয়ে হুশ ফিরিয়ে আনুক। ও তো মুসলিম। তাই না? কখনও ইসলাম নিয়ে ভেবেছে? আর এখন কোন মুখে এইসব ফালতু জিনিস প্রচার করে বেড়াচ্ছে? যদিও ফারহানার মুখে এসবের প্রতিবাদ একটু অদ্ভুত শোনাবে। কিন্তু ও আর চুপ করে থাকতে পারলো না।

"হয়তো তোমার শুনে ভালো লাগবে যে, আমি কাউকে খুশি করার জন্য হিজাব পরছি না। এটা আমার নিজের বিশ্বাস। আর ইসলামের পথে এগিয়ে যাওয়ার একটা পদক্ষেপ। বিশেষ করে এই পবিত্র রমজান মাসে আমাদের সবারই দ্বীন নিয়ে ভাবা উচিৎ।"

সবাই চুপ হয়ে গেলো। আর একটু পরেই তাদের ইংলিশ টিচার মিস রবিনসন ক্লাসে ঢুকলেন। সবাইকে নিজের জায়গায় ফেরত যেতে হলো। মিস রবিনসন সবাইকে তাদের গত সপ্তাহে লেখা রচনা ফেরত দিতে লাগলেন।

"ফারহানা আহমেদ?" তিনি সামনের দিকে তাকিয়ে এক জোড়া সবুজ চোখ আর উজ্জ্বল চুলের মেয়েকে খুঁজতে লাগলেন। তার পরিচিত একটা মুখ। সাদা স্কার্ফ পরা মেয়েটাই যে ফারহানা এটা বুঝতে তার বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগলো।

"জি মিস" জবাব এলো।

"ফারহানা? তোমাকে... অন্যরকম লাগছে...।"

"ও বোরকা ধরার রাস্তায় আছে মিস"। কেউ একজন পিছন থেকে জোরে বলে উঠলো। রবিনার বান্ধবীরা সবাই হেসে ফেললো।

মিস রবিনসন একটা মুচকি হাসি দিলেন। "আমার মনে হয় ফারহানা বেশ স্মার্ট। সে অন্তত বোরকা পরবে না। তাই না ফারহানা?"
ফারহানার খারাপ লাগছে। তাকে নিয়ে এসব কী শুরু হয়েছে?
"আমি আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না মিস।"
"ওহ নাহ কিছু না ফারহানা। বাদ দাও...।"
ফারহানার মাথার মধ্যে একটা পোকা নাড়া দিয়ে উঠলো। সে অনেকটা সময় বিতর্ক করে কাটিয়েছে। এতটা সহজে সবকিছু মেনে নেওয়ার মেয়ে সে না। এই ক্লাসটা তার জন্য এখন যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে গেছে। মিস রবিনসন সবসময় মেয়েদের উৎসাহিত করেন, যাতে তারা নিজেদের চিন্তাভাবনা অন্যদের সামনে নিয়ে আসে। অন্যদের চ্যালেঞ্জ করে।
"মিস" ফারহানা শান্ত স্বরে বললো, "আপনার কি মনে হয় কারও পোশাক তাকে কম বা বেশি বুদ্ধিমান বানিয়ে দেয়?"
"না, অবশ্যই না" তার শিক্ষিকা বললেন। "সব মেয়ের অধিকার আছে নিজের ইচ্ছামত পোশাক পরার।"
"আপনার কি মনে হয় নানদের উপর জুলুম করা হচ্ছে?"
"না একেবারেই না। তারা নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী জীবন যাপন করছেন।"
"তাহলে ইচ্ছাটাই এখানে মুখ্য তাই তো? তাহলে যদি কেউ স্কার্ফ পরতে চায়? কিংবা বোরকা? এটাতে কি তাকে দমিয়ে রাখা হবে?"
"ইচ্ছামত পোশাক পরার কথা আসলে যেটা বলতে হয়, সেটা হচ্ছে বেশিরভাগ মুসলিম মেয়ে কিন্তু নিজের ইচ্ছায় এই পোশাক পরছে না।"
"এটা কি শুধু আপনার অনুমান? নাকি আপনার কাছে প্রমাণ আছে?"
পুরো ক্লাসে নীরবতা নেমে এলো। মেয়েরা অস্থির হয়ে এই তর্কের শেষ দেখতে চাইছে।
"অনুমানই বলতে পারো।"
"ঠিক তাই। যদি কোন বুদ্ধিমতি, মেধাবী ও শিক্ষিত মেয়ে নিজের ইচ্ছায় হিজাব পরে সে কি অন্য হিজাব না পরা মেয়ের চাইতে কম মেধাবী হয়ে যাবে?"

"দেখো ফারহানা আমি তো এমনিতেই বলছিলাম।"
"মিস! কেউ যদি আমার পোশাক দেখে আমি কতোটা মেধাবী এটা যাচাই করতে আসে, তাহলে আমি সেটা চুপচাপ মেনে নিবো না। আমার মনে হয় এটা অন্যায়। আমি যদি আপনি অথবা অন্য কারো স্কার্টের ঝুল কতো লম্বা, সেটা দেখে তার মেধা যাচাই করতে যাই; সেটাও ততটাই অন্যায় হবে। আপনি কি আমার কথার সাথে একমত?"
মিস রবিনসন ফারহানার যুক্তি বুঝতে পেরে হেসে ফেললেন। বাকিরাও ফারহানার প্রশংসা করতে লাগলো।
"তুমি জিতে গেছো ফারহানা। এখন কি আমি সবার রচনা ফেরত দিতে পারি?"
"দেখলেন মিস! হিজাব থাকুক কিংবা না থাকুক; তর্কে ওর সাথে কেউ পারবে না" কারলা বলে উঠলো। ফারহানা হেসে ফেললো। ওর পুরো মুখ থেকে গরম হাওয়া বের হচ্ছে। একটা জিনিস তো নিশ্চিত, তার হিজাব স্কুলে তাকে থামাতে পারবে না। সে এখনও আগের ফারহানা আহমেদই আছে।
সে তার এ পাওয়া রচনার দিকে তাকিয়ে নিজেকে বললো, এটা তুমি কখনও নিজেকে ভুলতে দেবে না।

একাদশ অধ্যায়
সম্মুখযাত্রা

ফারাজ সারাটা ক্লাস উসখুস করে কাটিয়েছে। আর একটু ফাঁকা সময় পাওয়ার সাথে সাথে ইমরানের নাম্বারে ফোন দিয়েছে।
ছয় বার ফোন করার পর কেউ একজন ফোন ধরলো।
"হ্যালো! আসসালামু আলাইকুম" ফারাজ ইতস্তত করে বললো। সাধারণত ও কখনো অচেনা কাউকে ফোন করে না। এইটুকুর মধ্যেই কপালে ঘাম জমে গেছে।
"ওয়ালাইকুম আসসালাম" অন্যপাশ থেকে জবাব এলো।
"ইমরান?" ফারাজ কণ্ঠস্বর শুনেই বুঝতে পেরেছে। কিন্তু তারপরও নিশ্চিত হয়ে নেয়া ভালো।
"জ্বি, আমি ইমরান। আপনি কে বলছেন?"
"আমম.. ফারাজ বলছি। সেদিন রাতে মসজিদে আমাদের দেখা হয়েছিলো। হারকোর্ট স্ট্রিটে আমার বাবার নিউজপেপারের দোকান আছে।"
"ও আচ্ছা!" ইমরানের গলা শুনেই বোঝা যাচ্ছে তার সব মনে আছে। ফারাজ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে নিজের ঘাম মুছলো।
"তুমি কেমন আছো ভাই?" ইমরান জিজ্ঞাসা করলো।
"আমি ভালো আছি। আচ্ছা শুনুন আমি গতকাল স্কুলে বসে আপনাদের ওয়েবসাইট ঘুরে দেখেছি।" ফারাজ সবসময় সরাসরি কাজের কথা বলতে ভালোবাসে।
"আচ্ছা?"
"আর আমার মনে হয়েছে এটা অসাধারণ। একেবারে অসাধারণ।"
"ওহ্, তোমার ভালো লেগেছে শুনে খুশি হলাম...। তোমার কি আলাদাভাবে কোনকিছুর উপর আগ্রহ আছে?"
"হ্যাঁ আমার আর্ট ভালো লাগে। সব ধরনের আর্ট। আর আমার আরবিতে গ্রাফিতি আঁকা শিল্পীকে খুবই ভালো লেগেছে। ওনার নাম কি?"

"তুমি কি আহমেদ আলীর কথা বলছো? ও আসলেই অনেক প্রতিভাবান। মাশা আল্লাহ্। তুমিও কি গ্রাফিতি আঁকো?"
"উমম আমি ক্লাসে ছোটোখাটো কিছু করেছি। কিন্তু কখনো বাইরে কোন দেয়ালে কিছু আঁকিনি।"
"তুমি কি আহমেদ আলীর ছবি আঁকা দেখতে চাও?"
ফারাজের চোখ বড় হয়ে গেলো। সে নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না।
"হ্যাঁ অবশ্যই! মানে, হ্যাঁ হ্যাঁ আমি দেখতে চাই!"
"ভালো; উনি আজ টাউন সেন্টারের এক দেয়ালে গ্রাফিতি আঁকবেন। আমাদের রমজানের একটা প্রচারণার জন্য। তুমিও চাইলে আসতে পারো। আমি তোমার সাথে ওনার পরিচয় করিয়ে দেবো।
ফারাজ তাড়াতাড়ি একটা কাগজে আহমেদ আলী আসার জায়গা আর সময় লিখে রাখলো। ওর হার্টবিট বেড়ে গেছে। কিছুতেই উত্তেজনা কমাতে পারছে না। সে ওখানে যাবেই ইনশাআল্লাহ।
"ঠিক আছে ভাই। পরে কথা হবে। তুমি আজকে তারাবীহ্ পড়তে আসছো তো, তাই না?" ইমরান জিজ্ঞাসা করলো।
"জ্বি ইনশাআল্লাহ। হয়তো পরে আপনার সাথে দেখা হবে।"
"হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ্। পরে দেখা হবে। আজ না হলেও কাল তো হবে। ঠিক আছে?"
"ঠিক আছে!....
ইমরান ফোন রেখে দিলো।
ফারাজ এই দিনটা শেষ হওয়ার জন্য আর অপেক্ষা করতে পারছে না। সারাদিনে ওর শুধু মি. ম্যাকারথির ক্লাস ভালো লাগে।
ক্লাসে ঢোকার আগে ফারাজ তার বোনকে মোবাইলে একটা টেক্সট পাঠালো। (সালাম, স্কুল শেষে আমার সাথে দেখা করবে)-ফারাজ।

□

ফারাজ অনেক আগ্রহ নিয়ে বাস স্টপে ফারহানার জন্য অপেক্ষা করছে। যখন ফারহানা বাস থেকে নামলো, ফারাজ প্রথমে নিজের বোনকে চিনতেই পারেনি। সকালে ওদের দুজনের দেখা হয়নি। তাই ও হিজাবের কথা জানতো না।

"হেই ফারহানা!" ফারাজ হাসলো, "তোমাকে সুন্দর লাগছে! স্কুলের বান্ধবীরা তোমাকে নতুনরূপে দেখে কী বললো?"

"উমম মোটামুটি" ফারহানা স্কার্ফ ঠিক করতে করতে বললো, "এমন কিছু নেই যা মিস ফারহানা আহমেদ করতে পারে না ।"

ফারাজ হেসে ফেললো, "সাবাস!"

"কিন্তু কী হয়েছে বলো তো ফারাজ? আমরা কোথায় যাচ্ছি?"

"আমি তোমাকে একজন মুসলিম আর্টিস্টের ছবি দেখাবো। তোমার মাথা ঘুরে যাবে!"

"আমরা আর্ট গ্যালারিতে যাচ্ছি?"

"নাহ, উনি রাস্তাকেই ওনার গ্যালারি বানিয়ে নিয়েছেন। চলো আমাদের এই বাসে যেতে হবে। আমি তোমাকে যেতে যেতে সব বলছি... ।"

ভাইকে এত খুশি দেখে ফারহানা আর কিছু না বলে বাসে উঠে বসলো।

ওরা যখন ফারাজের লেখা ঠিকানায় পৌছালো, সেখানে ততক্ষণে ছোটখাটো একটা ভিড় জমে গেছে। ওরা মানুষের ভিড় ঠেলে সামনে আগালো।

দোকানের সারির শেষ মাথায় ওরা একটা বিশাল দেয়াল দেখতে পেলো। দেয়ালের অবস্থা হয়তো কোন একসময় ভালো ছিলো। ফারাজ দেয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটাকে চিনতে পারলো। উনিই আহমেদ আলী। ছবিতে দেখতে ওনাকে যেমন বিশাল লাগে, উনি বাস্তবেও তেমন। চোখে কালো চশমা পরেছেন। আর আর্মি জ্যাকেটের পকেটগুলোর ফাঁকা দিয়ে অনেকগুলো স্প্রে ক্যান দেখা যাচ্ছে।

উনি দেয়ালের এক কোণায় দাঁড়িয়ে আছেন। পুরনো ইটগুলোর দিকে তাকিয়ে হয়তো কি আঁকবেন ভাবছেন।
"ঐ যে উনি" ফারাজ তার বোনকে আঙুল দিয়ে চিনিয়ে দিলো।
আর তারপরই হঠাৎ করে আহমেদ আলী তার কাজ শুরু করলেন। একটা বিশাল মৌমাছির মত উনি পুরো দেয়াল জুড়ে উড়ে উড়ে রং ছড়িয়ে যাচ্ছেন। প্রথমে উজ্জ্বল রং তারপর হালকা রং। এমনভাবে আরবি হরফগুলো লেখা, যেন সেগুলো জীবন্ত হয়ে গেছে। এরপর উনি ঝিকিমিকি রং দিয়ে লেখাগুলোর বাইরের অংশ রাঙিয়ে দিলেন। পুরো দেয়ালের চেহারা মনে হয় যেন জীবনের ছোঁয়া পেয়ে সম্পূর্ণ বদলে গেছে। চারিদিকের বাতাসে স্প্রে ও পেইন্টের গন্ধ।
জটলা করা লোকেরা লেখাটা পড়ার চেষ্টা করলো। শুকরান, কৃতজ্ঞতা বলে অনেকেই তালি দিয়ে উঠলো। আহমেদ আলী টেলিভিশনের ক্যামেরার সামনে একটা ছোট্ট বক্তৃতা দিলেন। আর এখানে তাকে ডাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ দিলেন। এরপর ইমরান ক্যামেরার সামনে এসে কিছু কথা বললো। তাদের এইখানে ছবি আঁকার অনুমতি দেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ দিয়ে সে ইসলামিক আরবান আর্ট প্রজেক্ট নিয়ে ছোট একটা বক্তৃতা দিয়ে তার কথা শেষ করলো। ফারাজের মনে হচ্ছিলো সে গর্বে ফেটে পড়বে। সে নিজের মনেই আবার ভাবতে লাগলো, অসাধারণ। সে তার বোনের দিকে তাকিয়ে দেখলো ফারহানাও হাসছে। ফারহানা ভাইয়ের হাত নিজের হাতে নিয়ে চেপে ধরলো ।
আমি যা দেখছি আমার বোনও তাই দেখছে। ফারাজ ভাবলো, আমার জন্য একটা সুন্দর ভবিষ্যৎ। এমন কিছু করতে পারবো, যা আমি ভালোবাসি।
"তুমি ওনাকে গিয়ে নিজের আর্ট দেখাও।" ফারহানা ফারাজকে সামনে ঠেলে দিলো।
ফারাজ প্রথমে একটু ইতস্তত করলো। কিন্তু সেটা শুধু কয়েক মুহূর্তের জন্য। অনুষ্ঠান শেষে সবাই যখন আহমেদ আলীকে ঘিরে ধরলো, ফারাজ নিজের ছবি আঁকার খাতা বুকের সাথে চেপে ধরে সোজা ইমরানের দিকে

হাঁটা শুরু করলো। তাকে আসতে দেখে ইমরানের মুখ হাসিতে ভরে উঠলো।
"আসসালামু আলাইকুম ছোট ভাই! তুমি তাহলে এসেছো!" ওরা হাত মিলিয়ে একে অপরকে জড়িয়ে ধরলো। ইমরান ঝুঁকে আহমেদ আলীর কানে কানে কিছু একটা বললো। আর আহমেদ আলী ফারাজের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, "আসসালামু আলাইকুম, তোমার সাথে একটু পরেই কথা বলছি" উনি এখনো মানুষকে অটোগ্রাফ দিচ্ছেন। তাদের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন। আর তাকে তার নতুন আঁকা ছবির সাথে ছবিও তুলতে হচ্ছে।
"আমি কি দেখতে পারি?" ইমরান জিজ্ঞাসা করলো। বোঝা যাচ্ছে ওদের বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।
ফারাজের একটু ভয় করছে। কিন্তু সে খাতাটা ইমরানের দিকে বাড়িয়ে দিলো। তারপর নিজে দেয়ালের ছবিটা আরেকটু ভালোভাবে দেখতে এগিয়ে গেলো। তার ছবি দেখার সময় ইমরানের অভিব্যক্তি সে দেখতে চায় না।
সে পিছনে ইমরানের পাতা উল্টানোর শব্দ পাচ্ছে। তার আঁকা নানা রকম ছবি।
"মাশাআল্লাহ ভাই! অসাধারণ।" তার কণ্ঠে প্রশংসা ঝরে পড়ছে। ফারাজ ইমরানের দিকে যখন ফিরলো, তখন ওর মুখ গরম হয়ে গেছে। কিন্তু ইমরানের সন্তুষ্ট মুখ দেখে ওর ভয় চলে গেলো।
"আহমেদকে এটা দেখাতে হবে!" ইমরান প্রায় দৌড়ে আহমেদ আলীর কাছে গেলো। তিনি তখন সাংবাদিক আর পত্রিকার লোকদের বিদায় জানাচ্ছেন।
"ভাই এই ছোট ছেলেটার আর্ট দেখো। তুমি মুগ্ধ হয়ে যাবে। মাশাআল্লাহ্!"
ফারাজ আহমেদ আলীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। উনি একের পর এক পাতা উল্টে যাচ্ছেন। কিছু কিছু ছবি উনি অনেক সময় নিয়ে দেখছেন। তার মুখে হাসি। তারপর তিনি ফারাজের দিকে তাকিয়ে

সুন্দরভাবে হাসলেন। লম্বা কালো চুল আর দাঁড়ির ফাঁকে তার চোখ জ্বলজ্বল করছে।

"তোমার মধ্যে সত্যিকারের প্রতিভা আছে ভাই! মাশাআল্লাহ! এই ছবিগুলো খুবই সুন্দর হয়েছে..। তোমার বয়স কতো?"

"ষোলো" ফারাজ জবাব দিলো।

আহমেদ ইমরানের দিকে ফিরে বললো, "এই ছেলেকে এক্ষণি নিয়ে নাও ইমরান। সংগঠনের জন্য আমাদের এমন প্রতিভা দরকার।" তারপর তিনি আবার ফারাজের দিকে তাকালেন, "আমি সামনের সপ্তাহে কিছুদিনের জন্য বাইরে যাচ্ছি। কিন্তু রমজানের শেষের দিকে ফিরে আসবো। তখন আরেকটা গ্রাফিতি আঁকবো। তুমি কি স্প্রে ক্যান দিয়ে ছবি আঁকতে পারো?"

ফারাজ মাথা নাড়লো।

"ভালো, তুমি কি আমার সাথে ছবি আঁকবে? একটা স্কুলের দেয়ালে ছবি আঁকতে হবে। আমার স্কুলটার নাম মনে পড়ছে না। আমার সাথে আশেপাশের এলাকার ছেলেরা থাকবে। কি বলো আসবে?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই। আমার তো শুনেই ভালো লাগছে।" ফারাজ বললো।

"এই নাও আমার কার্ড। এখানে ইমেইল এড্রেস আছে। ইভেন্ট শুরু হওয়ার আগে আমার সাথে যোগাযোগ করবে। ঠিক আছে? আমি বেশি কাউকে সাথে নিতে পারবো না তো...।"

ইমরান তাকে থামিয়ে দিলো, "চিন্তা করো না আহমেদ! ফারাজ যাবে তোমার সাথে। এই শহরে আরও অনেক কাজ করতে হবে। যুবকদের অনেককিছু করার আছে। ধীরে ধীরে সবাই বিপথে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন শহর তাদের একে একে গিলে খাচ্ছে।"

"আমি জানি। তুমি তো জানো আমিও একটা সময় ওদের দলেই ছিলাম। নিজেকে সামলানো কঠিন। বিশেষ করে তখন, যখন তোমার সামনে ভালো কোন রাস্তা খোলা থাকে না।"

"আমরা আশা করছি আমাদের প্রজেক্টের মাধ্যমে কিছুটা পরিবর্তন আনতে পারবো। ওদেরকে ভালো কিছু করার সুযোগ দেওয়া সম্ভব হবে।"

ফারাজ তাদের কথা অস্পষ্টভাবে শুনতে পাচ্ছে। সে নিজেকে কল্পনা করছে বিশাল এক দেয়ালের সামনে। হাতে স্প্রে ক্যান, চোখের সামনে ইটের দেয়ালে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। ওর আর তর সইছে না।
"শোন একটু পরেই ইফতারের সময় হয়ে যাবে। তুমি কি আমার সাথে আসছো আহমেদ?"
"নাহ, আমি আমার স্ত্রীকে কথা দিয়েছি তাকে বাইরে খেতে নিয়ে যাবো। এখানে ও এখনো ভালোভাবে কিছু দেখেনি।"
"ঠিক আছে তাহলে। আমরা আজ যাই। কি বলো ফারাজ?"
"হ্যাঁ আমাকে বাড়ি যেতে হবে। আমার বোন ঐখানে দাঁড়িয়ে আছে। আর আম্মাও বাড়িতে অপেক্ষা করে থাকবেন।"
বাকি দুইজন দূরে দাঁড়ানো ফারহানার দিকে তাকিয়ে সালামের ভঙ্গিতে হাত উঁচু করে সাথে সাথে চোখ নামিয়ে নিলেন।
ফারাজ তার আর্টখাতা ব্যাগে ঢুকিয়ে ফেললো। "আবার দেখা হবে তাহলে। মসজিদে দেখা হচ্ছে?" ইমরান বলল।
"ইনশাআল্লাহ্" ইমরান ফারাজের সাথে হাত মিলিয়ে আবার তাকে জড়িয়ে ধরলো। "ছবি আঁকা চালিয়ে যাও। ঠিক আছে? আমি তোমাকে পরের ইভেন্টের সব তথ্য ইমেইল করে দেবো।"
ফারাজ প্রায় দৌড়ে ফারহানার কাছে গেলো।
"তারপর?" ফারহানা গভীর আগ্রহে জানতে চাইলো, "উনি কী বললেন?"
ফারাজ লজ্জায় মাথা নিচু করে ফেলেছে। "উনি বলেছেন আমার মধ্যে প্রতিভা আছে। ওনাদের আর্ট প্রজেক্টে আমাকে যোগ দিতে বলেছেন। আর হয়তো আহমেদ আলীর সাথে দেয়ালে ছবি আঁকার সুযোগও পাবো।"
"এটা তো অসম্ভব ভালো খবর ফারাজ!" ফারহানা খুশিতে ডগমগ করছে। "আমি অনেক খুশি হয়েছি ফারাজ! " সে ভাইয়ের হাতে একটা ঝাঁকি দিলো।
"তুমি যে অনেক ভালো এটা কি তুমি জানো? সব সময় আমাকে উৎসাহ দাও...।"
"এটাই তো বোনদের কাজ!"

ওরা দুজনে হেসে ফেললো। তারপর ওরা বাসে উঠে বাড়ির দিকে রওয়ানা দিলো।
এইবারের রমজান সত্যিকার অর্থেই ওদের জীবনে অনেক ভালো জিনিস বয়ে নিয়ে আসছে।

জমজরা আগের দিনের মতই বাবা মায়ের সাথে বসে সাহ্‌রী খেলো।
ফারাজ অনেক খুশি। সারাদিন না খেয়ে থাকার পরেও তার ওজন ঠিক আছে। আর ফারহানাও তার নিজের ওজন নিয়ে সন্তুষ্ট। যদিও দুইজনের চিন্তার কারণ সম্পূর্ণ আলাদা।

প্রতিদিন তারা পরিবারের সবাই মিলে একসাথে ফজরের নামাজ আদায় করে। জমজ ভাইবোনেরা একটা রুটিন করে ফেলেছে। যখন ওদের বাবা মা আবার ঘুমাতে চলে যান, ওরা জেগে থেকে কুরআন পড়ে। ফারাজ তারাবীতে যে আয়াতগুলো পড়া হবে, সেগুলো আগে থেকেই অর্থসহ পড়ে রাখে। আর তার সাথে ফারহানাও পড়ে। এবার সে ঠিক করে রেখেছে, রমজানে পুরো কুরআন পড়ে শেষ করবে। এই সাহ্‌রী আর ইফতারের পরে একসাথে কাটানো সময়, সেই সাথে তাদের ফুফুর পাঠানো ইমেইল তাদের দু'জনকে আবার আগের মত কাছাকাছি নিয়ে এসেছে।
ফারহানা প্রতিদিন সকালে হিজাব মাথায় দেয় আর আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করে। এখনও তাকে বড় কোন সমস্যায় পড়তে হয়নি। সে নিয়মিত সালাত আদায় করে। সব রোজা করে যেতে পারছে। আর যারা অন্যদের গীবত করে তাদের থেকে দূরেও থাকতে পারছে। তার পড়ালেখাও আগের মত ভালোভাবে চলছে।
সে প্রতি রাতে নাজমা ফুফুর সাথে কথা বলে। তিনি সব কাজে ফারহানাকে উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছেন।

আর ফারহানাও ধীরে ধীরে নিজের মধ্যে পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছে। রমজান এখন তার কাছে শুধু না খেয়ে থাকার একটা মাস নয়। সে সময়ের সাথে সাথে একজন প্রকৃত মুসলিম হয়ে উঠছে।
ফারাজও একই জিনিস অনুভব করে। সেও নিয়মিত নামাজ পড়ে, কুরআন পড়ে। নিজের পরিবর্তন সেও বুঝতে পারছে।
রাতের দীর্ঘ সালাতের রেশ দিনেও থেকে যায়। হ্যাঁ সে ক্লান্ত থাকে; কিন্তু মানসিকভাবে প্রশান্তিতে থাকে। সে আর নিজেকে প্রমাণ করার জন্য মরিয়া হয়ে নেই। তার আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়ে গেছে। আর কেন জানি স্কুলও এখন তুলনামূলক শান্ত। আগের চাইতে কম মারামারি হয়। এমনকি মাজকেও আর ফারাজের চোখে পড়ে না।
ফারাজ এই সব কিছুর জন্য কৃতজ্ঞ। সে চায় না মাজ বা অন্য কারও জন্য তাকে বিপথে যেতে হোক। অদ্ভুত ব্যপার হচ্ছে সে স্ক্রুজের কোনও খবরও ইদানীং আর পাচ্ছে না। স্ক্রুজ যেন অনেক দূর অতীতের একটা অংশ; যার সামনাসামনি তাকে আর কোনও দিন হতে হবে না।
এখনকার জন্য এটা মেনে নেওয়াই ভালো, যে সব কিছু ঠিকঠাক চলবে। ফারাজ তার ঈমানকে আকড়ে ধরে ধীরে ধীরে আরো দৃঢ় হয়ে উঠতে পারবে।

দ্বাদশ অধ্যায়
প্রলোভন

জীবন অনেক অদ্ভুত। একটা ছোট্ট ফোন কলই এক নিমিষে সব পাল্টে দিতে পারে।

"ফারাজ! তুমি কোথায় ছিলে বন্ধু?"

ফারাজ ফোনের অপর পাশে থাকা মোটা কণ্ঠস্বর চিনতে পারলো। ওর মুখ শুকিয়ে গেলো। এতো ক্লুজ।

"হাই ক্লুজ" ফারাজ কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করলো। "তুমি কোথায় থাকো? অনেকদিন তোমার কোনও খোঁজ খবর নেই...।"

"আমি লন্ডনে গিয়েছিলাম। উমম, কিছুদিনের জন্য ডুব দিয়েছিলাম আর কি। এখন আর ভয় নেই। সব ঝামেলা মিটে গেছে। আমাদের একদিন একসাথে আড্ডা দেওয়া দরকার বন্ধু।

না দরকার নেই। ফারাজ ভাবলো, আমি কিছুতেই আর এসব চাই না।

"আমি যখন ছিলোম না, দলের বাকিদের সাথে কি তোমার দেখা হয়েছে?"

"উমম, আমিও এখন কিছুদিন সবকিছু থেকে দূরে আছি...।"

"আরে এখন আমি এসে গেছি। আর কোনও সমস্যা নেই। আবার তুমি আমাদের সাথে ঘুরতে পারবে। এখনও তো তোমাকে ভালোভাবে দলে নেওয়া হয়নি।"

"ভালোভাবে দলে নেওয়া?"

"আরে ঐ তো আনুষ্ঠানিকভাবে। আমাদের একজন করে নেওয়া আর কি। তুমি এখনও তো পুরোপুরি আমাদের সদস্য হও নি, তাই না?"

"ওহ হ্যাঁ..." ফারাজ মিনমিন করে বললো। এর হাত থেকে সে কীভাবে মুক্তি পাবে? ও বড় করে নিশ্বাস নিলো। "আসলে কথা হচ্ছে কি ক্লুজ! এখন আমি অনেক ব্যাস্ত। আমি তোমাদের সাথে আর কয় সপ্তাহ পরে দেখা করি?"

স্ক্রুজ জবাব দিতে বেশ খানিকক্ষণ সময় নিলো। তারপর তার ধারালো কণ্ঠস্বর শোনা গেলো, "স্ক্রুজ ডাকলে তোমাকে আসতে হবে। এটাই নিয়ম। হয় তুমি দলে থাকবে। না হয় থাকবে না। তুমি তো আমার দলে থাকতে চাও। নাকি?"
ফারাজকে আবার মিথ্যা বলতে হলো, "হ্যাঁ অবশ্যই।"
"ব্যাস! হয়ে গেলো তাহলে। আমি কাল স্কুল শেষে তোমাকে গিয়ে নিয়ে আসবো। আজকে একটু কাজ আছে।"
"ঠিক আছে।"
"পরে দেখা হচ্ছে তাহলে।"
ফারাজ ফোন বন্ধ করে দিলো। নিজেকে তার ধিক্কার দিতে ইচ্ছা করছে। তুমি কিসের মধ্যে নিজেকে জড়াচ্ছো?
ঠিক তখনই কেউ একজন জোরে তার পিঠে একটা চাপড় বসালো। ঘটনার আকস্মিকতায় ফারাজ তার জায়গা থেকে ছিটকে সামনে পড়ে গেলো। একটুর জন্য ওর মুখটা দেয়ালের সাথে লাগেনি। ফোন হাত থেকে মাটিতে পড়ে গেছে।
"তোমার আর আমার হিসাব-নিকাশ তো এখনও বাকি আছে!" তার পিছনে মাজ দাঁড়িয়ে।
ফারাজের বুক কেঁপে উঠলো। তার অসুস্থ অসুস্থ লাগছে। কিন্তু মাজকে কিছুতেই বুঝতে দেওয়া যাবে না যে সে ভয় পেয়েছে।
ফারাজ সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো।
তুমি রোজা আছো! এর সাথে এখন তুমি কিছুতেই মারামারি করতে পারবে না! মুহূর্তের মধ্যে তার মাথায় বিদ্যুৎ খেলে গেলো। রমজানে ঝগড়া ফ্যাসাদ নিষিদ্ধ। এই পবিত্র মাসে রাগারাগি করাও নিষেধ আছে। কিন্তু এখন সে কীভাবে পিছু হটবে।
ও মাজের মুখোমুখি দাঁড়ালো।
"তোমার সমস্যাটা কি?" ফারাজ উঁচু গলায় জিজ্ঞাসা করলো ।
মাজ গালাগালি দিতে দিতে দুই হাতে ফারাজকে ঠেলে পিছনে নিয়ে যেতে লাগলো।

ফারাজের মাথায় রক্ত চড়ে গেছে। সেও সর্বশক্তি প্রয়োগ করে মাজের হাত ওর বুকের উপর থেকে সরানোর চেষ্টা করছে।
মাজ ফারাজকে দেয়ালের সাথে ঠেসে ধরলো।
কিন্তু তখনই ওদের ক্লাসের ঘণ্টা পড়ে গেলো। বারান্দায় টিচারের গলা শুনতে পাওয়া যাচ্ছে।
"এই কী হচ্ছে ওখানে?"
মাজ ফারাজের বুকে শেষ একটা ঘুষি দিয়ে এগিয়ে আসা টিচারের দিকে তাকিয়ে হাসি মুখে বললো, "কিছু না মিস! এমনি দুষ্টুমি করছি। আর কিছু না"
টিচার ফারাজের জবাব শোনার জন্য তার দিকে তাকালেন।
ফারাজ প্রচণ্ড ব্যাথার মধ্যে কোনও রকমে মুখে হাসি এনে বললো, "সরি মিস! আসলেই তেমন কিছু না...।"
উনি মনে হয় না এদের কথা বিশ্বাস করলেন। "ক্লাসের ঘণ্টা পড়ে গেছে। তোমরা এখনও বাইরে কি করছো? যাও ক্লাসে যাও!"
ওরা দুজনেই তাড়াতাড়ি ক্লাসের দিকে রওয়ানা দিলো। ফারাজ বুকে আর পিঠে ব্যাথা নিয়ে সোজা হাঁটার চেষ্টা করছে।
টিচার দাঁড়িয়ে থেকে ওদের চলে যাওয়া দেখলেন। এই এশিয়ান ছেলেগুলো কোনও কাজের না। খামোখা পরিবেশ নষ্ট করছে।
বাড়ি পৌঁছানোর পর ফারাজ বুঝতে পারলো মাজ তার ফোন নিয়ে গেছে!

ইফতারের সময় বাড়ির সবাইকে সে ফোনের ঘটনা বললো।
ফারহানা রেগে গেছে। "তোমার স্কুলের সবার মাথা খারাপ! এসব কিছু আটকায় না কেন?"
আম্মাজিও চিন্তায় পড়ে গেলেন। তারা এই স্কুলে ফারাজকে পাঠিয়েছেন কারণ এটা বাড়ির কাছে। আর এখানে অনেক পাকিস্তানি ছেলে পড়ে। মুসলিম স্কুলের খরচ চালানোর সামর্থ্য তাদের নেই। তাই তাদের কাছে এই স্কুলই ভালো মনে হয়েছে। কিন্তু এখন মাঝে মাঝেই তার কাছে মনে

হয় সিদ্ধান্তটা ভুল ছিলো।

অন্যদিকে ওদের বাবা পুরো ঘটানা হেসে উড়িয়ে দিলেন। "ছেলেরা দুষ্টুমি করবেই। এটা নিয়ে এত ভাবার কিছু নেই। উজমা! তুমি তো ছেলেকে আঁচলের তলায় রেখে দিয়েছো!"
"আমার কিন্তু এসব ভালো মনে হচ্ছে না। ছেলেটা আমাদের বাচ্চাকে মেরে তার ফোন নিয়ে চলে গেছে। আমার মনে হয় আমাদের কিছু করা উচিৎ।"
"উফফ, কোন না কোনদিন তো ওকে নিজেকে রক্ষা করতে জানতে হবে! তুমি জানো, স্কুলে আমি কত মারামারি করেছি? আমার মাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করো উনি সব বলবেন। পনেরো বছর বয়সের পর থেকেই কেউ আমার গায়ে হাত দেয়নি। সবাই আমাকে ভয় পেতো!"
আম্মাজি বিরক্ত হলেন। হ্যাঁ কিন্তু ফারাজ তো তোমার মত না! তুমি কি দেখতে পাও না! কিন্তু উনি মুখে শুধু বললেন, "তো, তাহলে ফোনের কী হবে?"
বাবা মাথা চুলকালেন। "ফোন অবশ্য আলাদা ব্যপার। আচ্ছা আমি কালকে প্রধান শিক্ষকের সাথে কথা বলবো। ফোন ফেরত পাওয়া যাবে। চিন্তা করো না।"
পরে ফারহানা ফারাজের রুমে এসে দেখলো, সে আঘাত পাওয়া জায়গায় ঔষধ লাগাচ্ছে। "ফারাজ! তুমি ঠিক আছো?"
ফারাজ মাথা নাড়লো। তারপর হেসে বললো, "এই মাজ ছেলেটা একটা গাধা! সব সময় আমার পিছনে লেগে থাকে! আমি এর সাথে সব ঝামেলা মিটিয়ে ফেলতে চাই.....।"
"হ্যাঁ, শুনে মনে হয় ছেলেটা বেশি ভালো না" তারপর সে থেমে বললো, "কিন্তু ফারাজ তুমি ওই জায়গা থেকে সরে গেলেই তো পারতে। তুমি রোজা ছিলে। এই অবস্থায় রাগারাগি, মারামারি এসব তো করা উচিৎ না।"
"তাহলে আমি কি করতাম? বলতাম, 'সরি ভাই আমি রোজা আছি। এই মারামারি ঈদের পরে করি?' একটু বাস্তব কথাবার্তা বলো ফারহানা!"

ফারাজের মুখ লাল হয়ে গেছে। তার নিজের জন্য লজ্জা লাগছে। সে নিজেও রমজানে মারামারি করতে চায় না। কিন্তু মানুষ তাকে বাধ্য করছে। "আমি জানি" ফারহানা মৃদু স্বরে বললো, "আমি জানি সব সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা কতোটা কঠিন। আর এই অনুভূতিগুলোই মাঝে মাঝে ভালো থাকার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

◘

ফারহানার কাছেও একটা কল এসেছে। স্কুল থেকে ফেরার সাথে সাথে অচেনা একটা নাম্বার থেকে কল পেয়ে ও রিসিভ করেছে।

গাধা কোথাকার। ওটা মালিকের কল ছিলো।

"ফারহানা?" মালিকের কণ্ঠস্বর আগের এতই কোমল, গাঢ়। কিছুক্ষণের জন্য ফারহানার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলো।

"ম-ম- মালিক?" ও কী বলবে ভেবে পায়নি।

"ফারহানা!" মালিকের মুখের স্বস্তির হাসি ওর কথায় বোঝা যাচ্ছে। "ফারহানা তুমি আমার ফোন কেন ধরছো না? আমার মাথা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তোমাকে ছাড়া। তুমি কোথায় ছিলে?"

ফাহানার পুরো পৃথিবী ঘুরছে। ওর নিজেকে সামলাতে বেশ সময় লাগলো। সে কি এই কথাগুলোই শুনতে চায়নি? কিন্তু এখন না। রমজানে না। বিশেষ করে যখন সে ঠিক করে রেখেছে সব রকম নিষিদ্ধ জিনিস থেকে নিজেকে দূরে রাখবে।

প্লিজ এখন না।

"আমম, মালিক এখন আমি একটু ব্যস্ত... তোমার সাথে পরে কথা হবে...।"

"ফারহানা! দাঁড়াও। দয়া করে ফোন রেখে দিও না! আমি তোমাকে একবার দেখতে চাই... ।"

"না মালিক! আমি এখন পারবো না। তুমি বুঝতে পারছো না। এসবের কোনও মানে নেই। আমরা একসাথে থাকতে পারবো না। আমি নিজেকে

বদলানোর চেষ্টা করছি। আর এই সম্পর্কটা কখনও টিকবে না। দয়া করে বোঝার চেষ্টা করো।"
"ফারহানা কোন সমস্যা? যাই হোক আমরা একসাথে কোনও একটা সমাধান বের করবো। আমি জানি আমরা পারবো। আমি তোমার সাথে থাকতে চাই। আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি তোমাকে ভালোবাসি।"
সব চুপচাপ!
শুধু বুকের ধুকপুকানির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।
আর কান্নার শব্দ।
এ কি পরীক্ষায় ফেললে। কি যন্ত্রণাদায়ক পরীক্ষা...।
"আমাকে আর ফোন করো না মালিক। আমি আর এই সম্পর্কে থাকতে পারবো না বুঝছো?"
ফারহানা কল কেটে ফোন বালিশের নিচে ঢুকিয়ে ফেললো।
কিন্তু আবার কল এলো। ফারহানা নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করছে। ওর চোখ দিয়ে শুধু পানিই ঝরে যাচ্ছে। মনে হলো যেন হাজার বছর পর একটা সময় কল আসা বন্ধ হয়ে গেলো।
ফারহানা একসময় চোখের পানি মুছে স্বাভাবিক হলো। সে নিজেকে বললো, এসব ভুলে যাও। এসবের কোনও মূল্য নেই এসব ভুলে
যাও সব আল্লাহ্‌র পরীক্ষা। আল্লাহ পথ দেখাবেন।
কিন্তু মালিক আবার ফোন দিলো।
আবার!
আবার!
ফারহানা ফোনের সুইচ অফ করে দিলো। এবার ও ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেছে। এক হাতে মুখ চেপে তাকে কান্নার শব্দ আটকাতে হচ্ছে। সে কিছুতেই থামতে পারছে না। এই কষ্টও আর সহ্য করা যাচ্ছে না। সে চাদর মুড়ি দিয়ে সারা বিছানায় গড়াগড়ি করেও কোনও ভাবে নিজেকে থামাতে পারছে না। এর থেকে মুক্তি নেই।

ত্রয়োদশ অধ্যায়
ভাঙনের শুরু

পরের দিন সকালে ফারাজ স্কুলে যেতে ভয় পাচ্ছিলো। সে রাতে অনেক দেরি করে ঘুমিয়েছে আর সাহ্‌রীর সময় উঠতে পারেনি। সে প্রথমে ভেবেছিলো আজ রোজা রাখবে না। কিন্তু পরে এই সিদ্ধান্ত বাতিল করে দিয়েছে। এভাবে অবহেলা করে রোজা বাদ দেয়া যাবে না। গতবছর সে একই কাজ করেছে। আর ওর আবার মাজের সামনাসামনি হতে সব চাইতে বেশি ভয় করছে। বাবা নিশ্চয়ই স্কুলে ফোন করে তার মোবাইলের কথা বলেছেন। এতে করে তাকে আরও ঝামেলায় পড়তে হবে।

স্টুপিড একটা। ফোনের জন্য ফারাজ আবার মাজের সাথে ঝামেলা করতে চায় না। তাছাড়া ফোন না থাকলে স্ক্রুজের সাথেও কথা বলা লাগবে না।

কিন্তু সারাদিন কোনও বাজে ঘটনা ছাড়াই কেটে গেলো। ফারাজ মাজকে কোথাও দেখতে পেলো না। আর প্রিন্সিপালের অফিস থেকেও তাকে কেউ ডেকে পাঠালো না। ফারাজ স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। হয়তো সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু স্কুল ছুটি হওয়ার পর সে গেটের সামনে স্ক্রুজের গাড়ি দেখতে পেলো। স্ক্রুজকে ফাঁকি দিয়ে বের হওয়া সম্ভব না। স্ক্রুজ আর তার চারজন সাগরেদ কালো বিএমডব্লিউতে বসে সিগারেট খাচ্ছে। গাড়ির ভিতর থেকে গান শোনা যাচ্ছে।

স্ক্রুজ তাকে দেখে হাত নাড়ালো। ফারাজ গাড়ির দিকে হেঁটে যেতে যেতে বুঝতে পারলো, স্কুলের ছেলেরা তার দিকে অন্যভাবে তাকিয়ে আছে।

এরা আমাকে হিংসা করে। আহাম্মক কোথাকার। সে ভাবলো।

"হেই বন্ধু! কী অবস্থা? অনেকদিন খোঁজ খবর নেই" স্ক্রুজ ফারাজকে জড়িয়ে ধরলো। ফারাজ ওর গা থেকে সিগারেট, পারফিউম আর ঘামের গন্ধ পাচ্ছে। স্ক্রুজ মনে হচ্ছে আকারে আরও বিশাল হয়ে গেছে।

ফারাজ বাকিদের সাথেও কুশল বিনিময় করলো। ওরা সবাই ওকে ঠিক পছন্দ করে না। এটা ফারাজ আগেই বুঝে গেছে।

স্ক্রুজ ওর মধ্যে কী দেখেছে? ওর আকার আকৃতি? দেখে মনে হয়েছে ও নিজেকে কাজে লাগাতে পারবে? নাকি ওর দূর্বলতা দেখেছে? সবসময় সবাইকে সন্তুষ্ট করতে চাওয়া। কোনকিছুর অংশ হতে চাওয়ার আকুতি?
ফারাজ গাড়িতে উঠতে উঠতে এই সব চিন্তা দূরে সরিয়ে দিলো। আমি কী করছি? কিন্তু এদের বিরুদ্ধে যাওয়ার সাহস তার নেই।
বাকিরাও একে একে গাড়িতে উঠে গেলে স্ক্রুজ ইঞ্জিন চালিয়ে দিলো। বিশাল জোরে গান চালিয়ে দিয়ে তারা মুহূর্তের মধ্যে চলে গেলো।
অনেকক্ষণ গাড়ি চালানোর পর ওরা শহরের একপাশে একটা মাঠের সামনে এসে থামলো। গাড়ির ভিতরের বাতাস ধোঁয়ায় ভারি হয়ে গেছে। সবাই ধুমপান করছে শুধু ফারাজ ছাড়া। ও কখনও নেশা করেনি। গাড়ির মধ্যে এত ধোঁয়াতেই তার মাথা ধরে গেছে।
বাকি ছেলেদের মেয়ে, গাড়ি আর বন্দুক নিয়ে আলোচনা ফারাজের ভালো লাগছে না।
তুমি এখানে কেন এসেছো ফারাজ? তুমি আসলেই এগুলো চাও?
সে জানতো অন্তত এখন তার জীবনে এসব জিনিসের জায়গা নেই। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগেই এগুলো ওর জীবনে অনেক কিছু ছিলো। কিন্তু এখন সব বদলে গেছে। সে কীভাবে এর থেকে মুক্তি পাবে?
একজন এবার তার দিকে সিগারেট এগিয়ে দিলো। সিগারেটের এক মাথা জ্বলছে আর হালকা ধোঁয়া উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে।
ফারাজ ইতস্তত করলো। সে ভাবতে থাকলো। সে নিজেকেই বলতে লাগলো তুমি এদের এই কথা বলো যে, আমি রোজা আছি। কিন্তু স্ক্রুজ কঠিন দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ফারাজ জানে তার পক্ষে কিছু বলা সম্ভব না।
সে হাত বাড়িয়ে জ্বলন্ত সিগারেট নিলো। মুভিতে যেভাবে দুই আঙুলের মাঝখানে সিগারেট ধরে মুখের সামনে নিয়ে আসে, সেও সেটাই করলো। তারপর আস্তে কওে টান দিলো। সিগারেটের আগুন উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠছে। ফারাজ কাগজ পোড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছে।

ধোঁয়া ফারাজের গলায় গিয়ে লাগলো। ঝাঁঝালো স্বাদে ওর চোখ দিয়ে পানি বের হয়ে আসলো। অনেক চেষ্টা করেও ও কাশি আটকাতে পারছে না। বুকের ভেতর থেকে ঠেলে উঠে আসছে সব। ভিতরের ধোঁয়া কাশির সাথে বাইরে বেরিয়ে আসছে। ও সিগারেট ফেরত দিয়ে দিলো।

বাকিরা হাসিতে ফেটে পড়লো। সবার নিজের প্রথম অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ে গেছে। ওর পিঠ চাপড়ে দিলো সবাই।

"প্রথমবার সবার সাথে এমন হয়" হেসে একটা লম্বা টান দিয়ে বললো।

ফারাজ হেসে জবাব দেয়ার চেষ্টা করলো। কিন্তু তার চোখ দিয়ে পানি পড়ে যাচ্ছে। সিগারেটের ধোঁয়ায় কিংবা লজ্জায়। তার চোখের পানি থামছে না। তার রোজা ভেঙে গেছে। সেও ভাঙতে শুরু করেছে।

কিন্তু বাকিরা ওকে নিয়ে হাসাহাসি করছে না, বরং ওকে হাসানোর চেষ্টা করছে। সবাইকে এই অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। আর সে এখন না চাইলেও এদের অংশ।

তারপর স্ক্রুজ কথা বলে উঠলো, "তো কী অবস্থা বলো ফারাজ? তোমার মাথার মধ্যে কী চলছে? তোমাকে একটু অন্যরকম লাগছে... ।"

ফারাজ মাথা নাড়ালো, "কিছু না। ওই স্কুলে একটু ঝামেলা হয়েছে তাই!"

"আচ্ছা?" স্ক্রুজ ফারাজের দিকে এগিয়ে এলো, "কে তোমার সাথে ঝামেলা করছে বলো?"

"আমার ক্লাসের একটা ছেলে মাজ। একদিন ক্লাসে আমার সাথে ঝামেলা বাধিয়ে দিয়েছিলো। বলছিলো আমার কোনও যোগ্যতা নেই। আর তুমিও আসবে না আমাকে সাহায্য করতে... । আর তারপর আমার ফোন নিয়ে চলে গেছে।"

"আচ্ছা" ফারাজ স্ক্রুজের চোখের দিকে তাকিয়ে ভয় পেয়ে গেলো, শীতল কিন্তু ক্রুদ্ধ।

"আরে এই ছেলেটা তো অন্য দলের" মো বললো, "ও ইস্টসাইড স্টেটের ছেলেগুলোর সাথে থাকে। অনেক ঝামেলা করে বেড়াচ্ছে।"

"তাহলে তো সময় এসে গেছে এদের ভালোমত শিক্ষা দেওয়ার কি বলো?" স্ক্রুজ বাকিদের দিকে তাকালো। সবাই একমত।

"গণ্ডগোল করা লোকেদের আসল জায়গা দেখিয়ে দিতে হবে। কীভাবে মানুষকে সম্মান করতে হয় ভুলে গেছে...।"
"এরা একদম কাউকে দাম দেয় না!"
"সবগুলোকে একদম ঠিক রাস্তায় নিয়ে আসতে হবে। বুঝেছো তোমরা। এখন এটাই আমাদের কাজ!"
গাড়ির মধ্যে সবাই রাগে ফুসছে। তারা নিজেদের লোকের অসম্মান মেনে নেবে না। ফারাজ একটা বিষয়ে শান্তি পাচ্ছে যে ওদের চোখে যে ক্রোধ দেখতে পাচ্ছে তার ফল এইবার অন্য কাউকে ভোগ করতে হবে।
তখনি দুজন মেয়ে ওদের গাড়ির দিকে এগিয়ে এলো। খাটো মেয়েটার কাছে একটা বাচ্চা। মেয়েগুলো ইংরেজ। চকমকে জামা কাপড় পরা। শক্ত করে চুল বাধা আর দুজনের কানের দুলও প্রায় একই রকম।
ওরা গাড়ির কাছে এসে ভিতরে উঁকি দিলো। স্ক্রুজ ওদের চিনতে পারলো। সে তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে পকেটে হাত ঢুকানো মেয়েটাকে জিজ্ঞাসা করলো, "হেই নাটালি! কেমন আছো জান?"
মেয়েটা একটা হাসি দিলো। সে স্ক্রুজের গাড়ি আর হিরার আংটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে।
"হ্যাঁ আমি ভালো আছি...। তোমাকে অনেকদিন দেখি না। ঘটনা কি? কোথায় ছিলে?"
"একটু কাজ পড়ে গিয়েছিলো" স্ক্রুজ জবাব দিলো, "তো এখন তুমি কোথায় যাচ্ছো?"
"আমার নানীর কাছে যাচ্ছি। মা বাড়ি নেই... ।"
"ওসব বাদ দাও। আমাদের সাথে আসো। অনেক মজা হবে।"
মেয়েগুলো হেসে ফেললো। "কোন ধরনের মজার কথা বলছো স্ক্রুজ?" সে স্ক্রুজের সাথে মজা করছে।
"তুমি তো জানো..." স্ক্রুজ গাড়িতে বসা বাকিদের দিকে তাকিয়ে হেসে বললো, "কি তোমরা মজা করতে চাও তো?"
বাকিরা মেয়েটার দিকে তাকিয়ে হেসে মাথা নাড়ালো।

"অন্য মেয়েটার কী হবে?" মো গাড়ি থেকে মাথা বের করে বাচ্চাওয়ালা মেয়েটাকে দেখিয়ে বললো।
স্ক্রুজ বললো, "ওর কী হবে? ও কি আসতে চায় আমাদের সাথে?"
নাটালি তার বান্ধবীর দিকে তাকালো। মেয়েটা বাচ্চার দিকে দেখিয়ে দিলো।
"বাচ্চা গিয়ে বাড়িতে রেখে আসো" নাটালি ফুসে উঠলো, "যাও আমরা অপেক্ষা করবো।"
ওর বান্ধবী প্রায় দৌড়ে গেলো।
মেয়েটা গাড়িতে উঠে সামনের সিটে বসে সিগারেট ধরালো। ফারাজ দেখলো মেয়েটা খুবই ছোট। এর বয়স কিছুতেই চৌদ্দ পনেরোর বেশি হবে না।
ফারাজের কাছে সবকিছু ভুল মনে হচ্ছে। সে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো। ধুসর রাস্তাগুলো হঠাৎ করে অনেক অচেনা মনে হচ্ছে।
গাড়ির বাকিরা হৈ চৈ করছে। অন্য মেয়েটা যখন বাচ্চা রেখে ফিরে আসলো সবাই চিৎকার করে তাকে স্বাগত জানালো। অন্য মেয়েটাও গাড়িতে উঠে সিগারেট খেতে লাগলো। তাহলে সবাই একই রাস্তার লোক।
ফারাজের মনে হচ্ছে তার চারপাশের বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে। সে স্ক্রুজের কাঁধে হাত দিয়ে ডাকলো। স্ক্রুজের মনোযোগ এখন নাটালির দিকে।
"আমি আজ তাড়াতাড়ি বাড়ি যেতে চাচ্ছিলাম" ফারাজকে কথাগুলো প্রায় চেঁচিয়ে বলতে হচ্ছে। তার চারপাশে গান আর মানুষের কথার শব্দে কিছু শোনা যাচ্ছে না।
স্ক্রুজ চোখ কুঁচকে তার দিকে তাকালো।
ও এভাবে কেন তাকিয়ে আছে? ও কী দেখতে চায়?
কিন্তু একটু পরেই স্ক্রুজ হেসে বললো, "আচ্ছা সমস্যা নেই। আমরা তোমাকে নামিয়ে দেবো। ঠিক আছে?"
"না না লাগবে না। আমি বাসে করে চলে যাবো।"
"কিন্তু তোমার বাড়ি তো বেশ দূরে...।"
"হ্যাঁ জানি। কিন্তু আমার একটা অন্য কাজ আছে।"

স্ক্রুজ মাথা নেড়ে বললো, "আচ্ছা ঠিক আছে। তোমাকে তাহলে কাল স্কুলে পৌঁছে দিই?"
"আচ্ছা" ফারাজ উত্তর দিয়ে তার ব্যাগ নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে গেলো। "আবার দেখা হবে।"
সে বিদায় জানানোর জন্য হাত উঠানোর আগেই ওদের গাড়ি হুস করে চলে গেলো। মেয়েগুলো আনন্দে চিৎকার করছে।
ফারাজের বাড়ি ফিরতে দুই ঘণ্টার বেশি সময় লাগলো। সে বাসে ঘুমিয়ে পড়েছিলো। তাই ঠিক জায়গায় নামতে পারেনি। ও প্রচণ্ড অসুস্থ অবস্থায় বাস থেকে নামলো।
অনেকে মসজিদ থেকে তারাবীহ্ পড়ে বাড়ি ফিরে আসছে। এই প্রথম ফারাজ তারাবীহ্ বাদ দিলো।
যখন ও বাড়িতে ফিরলো তখন পুরো বাড়ি অন্ধকার। ও সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যাচ্ছিলো। তখন দেখলো কেউ একজন নিচের রুমে টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে শুয়ে আছে।
ফারাজ এগিয়ে এসে দেখলো ফারহানা সোফায় ঘুমাচ্ছে। ওর হাতের কাছে একটা বই। মোবাইল উল্টো করে ফ্লোরে রাখা। ফারাজ মোবাইল তুলে নিলো। ম নামে সেভ করা একটা নাম্বার থেকে সাতটা মিসকল উঠে আছে। ও তাড়াতাড়ি ফোন নামিয়ে রাখলো।
বোনের ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে ফারাজের মন নরম হয়ে গেলো। ও আমার জন্য অপেক্ষা করছে। কী করছিলো। কাদের সাথে ছিলো। এসব ভেবে ফারাজ লজ্জায় কুঁকড়ে গেলো।
সোফার এক পাশে একটা ছোট চাদর ভাঁজ করে রাখা। ফারাজ সেটা খুলে আস্তে করে ফারহানার গায়ে দিয়ে দিলো। কাপড়ের ছোঁয়ায় ফারহানা চোখ মেলে তাকালো।
"ফারাজ...?" ওর কণ্ঠস্বর ঘুমে গাঢ় হয়ে গেছে।
"আমি এসে গেছি বোন" ফারাজ ফিসফিসিয়ে বললো।
"এখন কয়টা বাজে?" ফারহানা উঠে বসলো। চোখ মুছে ঘড়ি দেখলো। "তুমি কোথায় ছিলে? তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন?"

“বন্ধুদের সাথে গাড়িতে করে ঘুরতে গিয়েছিলাম।”
ফারহানা দীর্ঘশ্বাস ফেললো, “ওহ্, আমি ভেবেছিলাম তুমি তারাবীহ্ পড়তে গেছো...। ”
“আমি আজকে তারাবীহ পড়তে পারিনি। আচ্ছা এখন আমি অনেক ক্লান্ত। ঘুমাতে যাই।” ফারাজ চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাড়ালো। কিন্তু ফারহানা তার হাত ধরে থামিয়ে দিলো।
“ফারাজ!” ফারহানা বললো, “তুমি ঠিক আছো তো?”
ফারাজ বোনের হাত ধরে অনেক কষ্টে কান্না আটকালো। ও চায় না ফারহানা চিন্তা করুক। “আমি ঠিক হয়ে যাবো বোন। চিন্তা করো না”
“ইনশাআল্লাহ্ ফারাজ, ইনশাআল্লাহ।”
ইনশাআল্লাহ। ফারাজ নিজেকে বললো, আমি ঠিক হয়ে যাবো।

চতুর্দশ অধ্যায়
অপরাধ ও বিচার

আম্মাজি এখনও মন থেকে ফারহানার হিজাব পরা মেনে নিতে পারেননি। তিনি যতবার ফারহানাকে হিজাবে দেখেন বিরক্ত হন। নানারকম বাজে মন্তব্য করেন। হিজাব বেশি বড়, বেশি চওড়া, দেখতে বুড়ি মানুষের মত লাগে। ফারহানাকে মানায় না। দেখতে বিশ্রী লাগে। আম্মাজি হঠাৎ করেই ফারহানার পড়াশোনা আর চাকরি নিয়ে চিন্তা করা শুরু করেছেন। হিজাব ওর পড়াশোনায় প্রভাব ফেলবে। রেজাল্ট খারাপ করবে। ফারহানা হিজাব পরে সব চাকরিও করতে পারবে না। হয়তো সমাজ থেকে একেবারে আলাদা হয়ে যেতে হবে।

প্রথম প্রথম ফারহানা মাকে বোঝানোর চেষ্টা করতো। "কিন্তু আম্মাজি" সে বলেছিলো, "রাসুলের সময়েও মেয়েরা স্কার্ফ পরতো। আল্লাহ্ কুরআনে বিশ্বাসীদের পর্দা করতে নির্দেশ দিয়েছেন... ।"

"শালীনভাবে চলতে বলেছেন ফারহানা! শালীন" মা জবাব দিয়েছিলেন। "দুইটার মধ্যে পার্থক্য আছে।"

"কিন্তু রাসুলের সব স্ত্রী হিজাব পরেছেন। আর সব মহিলা সাহাবীও।"

কিন্তু আম্মাজি ফারহানার যুক্তি মেনে নিতে নারাজ।

"আমার মা প্রতিদিন কুরআন পড়তেন ফারহানা। তিনি ভালো ব্যবহারের জন্য সবার কাছে পরিচিত ছিলেন। আর উনি কখনো হিজাব পরেননি। তুমি কি বলতে চাও উনি একজন খারাপ মানুষ? তোমার নানীজিকে কি তুমি খারাপ বলতে চাইছো? আমাকে খারাপ বলছো?"

"আম্মাজি আমার হিজাব পরার সাথে নানীজি, আপনি বা অন্য কারো কোনও সম্পর্ক নেই! আমি হিজাব পরছি আল্লাহর জন্য। দয়া করে বোঝার চেষ্টা করুন। আমি কাউকে খারাপ বলছি না।"

"অবশ্যই বলছো!" তার মা তাকে থামিয়ে দিয়েছিলো। "তুমি বোঝাতে চাইছো যে, তুমি একা ঠিক আর আমরা সবাই ভুল। তুমি আমাদের চাইতে ভালো মুসলিম। তোমার বড়দের চাইতেও তুমি বেশি বোঝো!"

ফারহানা তারপর থেকে আম্মাজির সাথে এই বিষয় নিয়ে তর্ক করা ছেড়ে দিয়েছে।

আর আম্মাজির সাথে হিজাব নিয়ে ঝামেলা বাঁধিয়ে এখন ফুফুর সাথে ইফতারে যাওয়ার অনুমতি তার কাছে চাইতে ফারহানা ভয় লাগছে। অনেক সাহস করে যখন সে মায়ের কাছে কথাটা বললো, তখন তিনি সোজা মানা করে দিলেন। ফারহানাকে অন্য কাজ ধরিয়ে দিলেন।

"না ফারহানা!" তিনি বললেন, "এই সপ্তাহে আমাদের অনেক ব্যস্ত থাকতে হবে। তোমার মুনির চাচা তার পরিবার নিয়ে আমাদের বাড়িতে ইফতার করবেন। আর সব রান্নাবান্না তো আমি একা করতে পারবো না।"

"কিন্তু আম্মাজি! নাজমা ফুফু আমাকে অনেক আগে দাওয়াত দিয়েছে। আমি না গেলে খারাপ লাগবে। আর এই বছর দাদীজানের বাড়ি ছাড়া আমি বাইরে আর কোথাও ইফতার করিনি...।"

"আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু আমার কিছু করার নেই ফারহানা। অনেক কাজ আছে। তুমি তো জানো, রমজানে এমনিতেই কতো ব্যস্ত থাকতে হয়। তোমার এইসব ঘোরাফেরা ঈদের পরে যতো ইচ্ছা করো...।"

"কিসের ঘোরাফেরা? আমি আজ পর্যন্ত কোথায় গেছি?" ফারহানার মাথা গরম হয়ে গেছে। সে কিছুতেই রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। কিন্তু এখন তো রাগলে চলবে না।

সে বড় একটা নিশ্বাস নিয়ে আবার ঠাণ্ডা গলায় বললো, "প্লিজ আম্মাজি! আমি যাওয়ার আগে সব কাজ করে যাবো...। আমার ইফতারের পর নাজমা ফুফুর সাথে মসজিদে তারাবীহও পড়তে যাওয়ার কথা আছে।"

আম্মাজি ফারহানার দিকে ঘুরে তাকালেন, সে মায়ের চোখে স্পষ্ট রাগ দেখতে পাচ্ছে।

"ও তাহলে এই ব্যপার? তুমি নাজমা আর ওর পাগল বন্ধুগুলোর সাথে ঘুরে বেড়াতে চাও? ভুলে যাও! এই ধরণের লোকেদের থেকে যতো দূরে থাকবে ততো ভালো। মাথার উপর এই জিনিসটা পরা শুরু করেছো তাই যথেষ্ট।

এরপরে আবার আবায়া, জিলবাব, নেকাব এগুলোও পরতে চাইবে। দিনরাত আমাদের ভুল ধরিয়ে দেবে। আর একদিন আধপাগলা দাঁড়িওয়ালা একজনকে বিয়ে করবে! আমি তোমার মাথায় এসব ফালতু চিন্তাভাবনা একদম ঢুকতে দিব না। তুমি এদের থেকে একদম দূরে থাকবে।"

ফারহানা নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। সে জানতো তার মা নাজমা ফুফুকে পছন্দ করেন না। কিন্তু এভাবে বলবেন সে ভাবেনি। তার মা এখনো নাজমা ফুফু আর তার বাড়াবাড়ি নিয়ে কথা বলে যাচ্ছেন।

ফারহানা জানে এখন কথা বলা মানে ঝামেলা আরো বাড়ানো। সে চুপচাপ মেঝের দিকে তাকিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

◘

শুক্রবার সন্ধ্যায় যখন মুনির কাকার পরিবার ইফতারে আসলো, ফারহানার নাজমা ফুফুর সাথে আর বাইরে যাওয়া হলো না। সে স্কুলের ডিবেট ক্লাবের মিটিং বাদ দিয়ে তাড়াতাড়ি বাসায় এসে মায়ের সাথে খাবার বানাতে লাগলো।

সব সময়ের মতই রান্না অনেক ভালো হয়েছে। ফারহানা নিজের বানানো রুটি নিয়ে সন্তুষ্ট। সবাই খেয়ে অনেক প্রশংসা করলো।

"হুমম, আমাদের তো সাজিদকে এই ঘটনা বলতে হবে" মুনির কাকা ফারহানার মায়ের দিকে একটা অর্থপূর্ণ হাসি দিলেন, "মেয়েকে তুমি ভালোই শেখাচ্ছো উজমা!"

আম্মাজি মুচকি হাসলেন।

ইফতারের পর ছেলেরা সবাই তারাবীহ্ পড়তে মসজিদে চলে গেলো। ফারহানা ওদের চলে যাওয়ার দিকে অসহায়ভাবে তাকিয়ে রইলো। সে আজকেও যেতে পারবে না। কিন্তু নাজমা ফুফু ঠিকই মসজিদে নামাজ পড়তে গেছেন। ফারহানার কষ্ট হতে লাগলো।

সে নিজেকে কাজে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করলো। সব পরিষ্কার করে সে বাড়িতেই নামাজ পড়বে। নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো।

সবকিছু ধুয়ে মুছে রেখে ফারহানা বাকিদের বিদায় জানাতে গেলো। কিন্তু লিভিং রুমের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ভিতর থেকে সে চাপা ধমকের সুর শুনতে পেলো।

"আমি কিছুতেই এর অনুমতি দেবো না!" দাদীজী আঙুল নাঁচিয়ে বলছিলেন।

"কিন্তু আমাদের আর কিই বা করার আছে আম্মাজি!" সাজেদা ফুফু থামানোর চেষ্টা করছেন। "ও যদি এটাই চায়।"

"ও চায় মানে?" দাদীজী এবার চেঁচিয়ে উঠলেন, "সবাই ইচ্ছামত বিয়ে করবে নাকি? ছিঃ কি লজ্জা! পুরো পরিবারের নাম ডুবাবে! একটা মেয়ের উপর তার পুরো পরিবারের ইজ্জত নির্ভর করে। মেয়ে তার বাবা মায়ের সম্মানের আর গর্বের জিনিস। সে কি চায় তার চাইতে নিশ্চয়ই এগুলোর মুল্য অনেক বেশি!"

"সব এই দেশে বাস করার ফল" দাদীজী বলে গেলেন, "ছেলেমেয়েদের মাথায় উল্টাপাল্টা বুদ্ধি আসে। আর তারা ভাবে আমরাও সাথে সাথে তাল মিলাবো। না একদম না।"

"আপনাকে তাল মিলাতে হবে না আম্মাজি" আনিসা ফুফু তার মায়ের হাত ধরে শান্ত করলেন, "ও আপনার সাথে এটা কীভাবে করতে পারলো? তাও আবার এখন?" সাজেদা ফুফু তাদের দুইজনের দিকে চোখ রাঙালেন। "আমরা এখানে বসে বসে ইজ্জতের কথা কেন বলছি? এটা আমাদের বোনের সারাজীবনের প্রশ্ন। ওর নিজের পছন্দ আর খুশির প্রশ্ন! আর তাছাড়া আনিসা! আমাদের মামাতো ভাই নাবিল, কই তুমিও তো তাকে বিয়ে করতে রাজি ছিলে না!"

আনিসা ফুফু দাদীজানের দিকে তাকালেন। পুরনো কথা মনে করে তার মুখ অন্ধকার হয়ে গেছে। তার কাজের জন্য পরিবারের লোকেরা অনেকদিন পর্যন্ত তাকে ক্ষমা করেনি।

"এখন এই কথা তুমি কেন ওঠালে আপা? ওটা বিশ বছর আগের ঘটনা...।"

"আমি শুধু একটা উদাহরণ দিলাম! তুমি যেভাবে তোমার মামাতো ভাইকে বিয়ে করতে রাজি হওনি; নাজমাও এখন বিয়ে করতে রাজি হচ্ছে না। শুধুমাত্র পাকিস্তানি আর ভালো চাকরি করে বলে রাজি হয়ে যেতে হবে এমন তো কোন কথা নেই!"

"তাই বলে একটা ইংরেজ সাজেদা? একটা ইংরেজ? এটা আমি কীভাবে মেনে নিবো? কীভাবে?" দাদীজীর চোখ পানিতে ভরে গেছে। তার মেয়ে একটা ইংরেজকে বিয়ে করবে এটা ভেবেই তিনি লজ্জায় কুঁকড়ে যাচ্ছেন। দাদীজী ওড়নায় মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলেন।

"কিন্তু ছেলেটা তো মুসলিম আম্মাজি? তাহলে সমস্যা কোথায়? আর এখন অনেক এশিয়ান মেয়ে ইংরেজদের বিয়ে করছে। তাদের অনেকে তো আবার মুসলিমও না। শুকরিয়া আদায় করুন যে নাজমা ওই রাস্তায় যাচ্ছে না।"

"তাতে কী আসে যায়? মানুষ কী ভাববে? আমরা কোন পাকিস্তানী ছেলে পাইনি, তাই আমাদের মেয়ে একটা ইংরেজকে বিয়ে করছে? কী লজ্জা! কী লজ্জা!"

তাহলে এই ব্যপার। ফারহানা দরজার আড়াল থেকে সামনে আসলো না। সে এখনো সবকিছু হজম করতে পারছে না।

তাহলে ফুফু অবশেষে বিয়ে করতে রাজি হয়েছেন। বাড়ির লোকেরা অনেকদিন আগে থেকেই বিয়ের কথা আলোচনা করছেন। পাকিস্তানিদের কাছে বিয়ে আসলেই অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আর পাকিস্তানি বিয়ে মানেই তো সব আত্মীয় স্বজনরা, সব মুসলিম পরিবার এক জায়গায় হওয়া। এটা শুধু দুইজন মানুষের মধ্যেকার সম্পর্ক র্না। বরং পরিবারের সাথে পরিবারের সম্পর্ক।

অনেকেই নাজমার জন্য বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছে। পারিবারিক বন্ধুদের ছের্লে। পাকিস্তানে থাকা খালাতো, মামাতো ভাইয়েরা। সবাই ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করা। ধার্মিক মেয়েকে বিয়ে করার জন্য সবাই আগ্রহী থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যখনই তারা নাজমা ঠিক কতটা ধার্মিক ভালোভাবে জানতে পেরেছে, পিছিয়ে গেছে।

ফারহানা তার মা ফুফুদের মুখে অনেকবার শুনেছে একজন ছেলের নাম। সে সব যোগ্যতার কোটা পূরণ করে গের্ছে। পাকিস্তানি, শিক্ষিত, ডাক্তার, ফর্সা, ভালো পরিবারের ছেলে, নম্র ও ভদ্র।
কিন্তু সমস্যা হচ্ছে নাজমা ফুফুর এইসব যোগ্যতা নিয়ে কোন মাথা ব্যথা নেই। উনি সবার মধ্যে আলাদা কিছু খুঁজেছেন। এই সব কিছুর চাইতে আলাদা কোন গুণ।
"আমি যে কোনও কাউকে বিয়ে করতে পারবো না" শেষবার যখন ওদের বিয়ে নিয়ে আলোচনা হয় তখন নাজমা বলেছিলো, "আমি এমন একজনকে খুঁজছি যে আমাকে বুঝবে। যার কাছ থেকে আমি কিছু শিখতে পারবো। আমাকে বিশ্বাস করবে এবং একসাথে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।"
"আর আপনার মনে হয় এইসব কিছু একজন দেশি মানুষের মধ্যে থাকবে?" ফারহানা ইয়ার্কি করে বলেছিলো।
"সত্যি কথা বলতে কি, সে যেখানকারই হোক তা নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই" ফুফু জবাব দিয়েছিলেন। "যদি একজন মুসলিম আর ভালো মনের মানুষ হন, আর আমাকে আমি যেমন সেভাবেই পছন্দ করেন সেটাই যথেষ্ট। অবশ্য অসম্ভব সুদর্শন হলেও ক্ষতি নেই!"
ও নাজমা ফুফু! আপনি আবার সবার বিরুদ্ধে গেলেন। সহজে সবকিছু মেনে নেওয়ার মেয়ে আপনি নন।
যদিও ফারহানার মায়ের আর অন্য ফুফুদের বাজে কথা শুনে খারাপ লাগছে। কিন্তু নাজমা ফুফুর সাহসের জন্য গর্ব না করে পারলো না।

তারাবীহ্‌র পর ছেলেরা সবাই বাড়ি ফিরে এলো। অনেকদিন সবাই এক জায়গায় হয় না। গল্প করার কতো বিষয় পড়ে আছে। সবাই এক জায়গায় বসার সাথে সাথে ফারাজের নতুন ফোন বেজে উঠলো। এখন তাকে কে ফোন দিচ্ছে? ফারাজের বাবা ছেলের নতুন ফোন দেখে অবাক হলেন। এটা ক্রুজ উপহার দিয়েছে।
খুব স্বাভাবিকভাবে ফারাজের সামনে মোবাইল ধরে বলেছে, "এই নাও।"

ফারাজের চোখ বড় হয়ে গিয়েছিলো। সব বড় বড় বিলবোর্ডে যে নতুন ফোনের বিজ্ঞাপন ঝুলছে সেই ফোন তার সামনে। "তুমি সত্যি বলছো? তুমি চাইলে আমি টাকা দিয়ে দিতে পারি।"
স্ক্রুজ শুধু নিজের সোনার দাঁত বের করে হেসেছিলো।
"নাহ্ ফারাজ! এসব এখন লাগবে না। তুমি শান্তি মত ফোন চালাও। তুমি তো আমার নিজের লোক তাই না? তুমি ছাড়া বাকিদের সবার কাছে এই ফোন আছে...।"
ফারাজের বুক একসাথে গর্বে আর লজ্জায় ভরে উঠেছিলো। সে কি আসলেই স্ক্রুজের দলে চলে গেছে? সে কীভাবে এদের বন্ধু হবে। যতবার এইসব লোকের সাথে সে মেশে, লজ্জায় ঘৃণায় তার মরে যেতে ইচ্ছা করে। তার মনে হয় সে নিজেকে ধোঁকা দিচ্ছে।
ফোনটা স্ক্রুজই করেছিলো। সে হাঁপাচ্ছে আর হড়বড় করে কথা বলছে।
"ফারাজ! এক্ষণি আসো"
ফারাজ তাড়াতাড়ি আড়ালে সরে গেলো। তার মাথায় এখনো কিছু ঢুকছে না।
"কোথায় আসবো?"
"আমরা ইস্টসাইড স্টেটে যাচ্ছি। ওই মাজ ছেলেটাকে উচিত শিক্ষা দিতে। তুমিও আসো।"
"কি! এখন?" ফারাজের মাথার মধ্যে এখন এইমাত্র শেষ করে আসা তারাবীহ আর কালকের না করা হোমওয়ার্ক ঘুরছে।
"হ্যাঁ ফারাজ!" অন্যপাশ থেকে ইস্পাতের মত কণ্ঠে জবাব এলো। "আমরা দশ মিনিটের মধ্যে আসছি। তৈরি থাকো।"
ফারাজকে হতবুদ্ধি করে দিয়ে ফোন কেটে গেলো। সে দাঁড়িয়ে শুধু ঘামছে।
"ফারাজ?" ফারহানা একগাদা বই হাতে বারান্দা দিয়ে হেঁটে আসছে। "তুমি ঠিক আছো? তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন?"

সে বই নামিয়ে রেখে ফারাজের দিকে এগিয়ে গেলো। কিন্তু ফারাজ তাকে পিছনে সরে যেতে বললো। পাশের রুমেই তাদের বাবা, কাকারা পাকিস্তানের বর্তমান সব খবর নিয়ে তুমুল আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে।
"আমি ঠিক আছি। একদম ঠিক আছি। একটু বাইরে যেতে হবে ব্যস।"
"ফারাজ কি হয়েছে? কোন সমস্যা?"
"কিছু না ফারহানা। চিন্তা করো না" ফারাজ যতটা সম্ভব গলার স্বর স্বাভাবিক করার চেষ্টা করলো। "আমার শুধু হঠাৎ একটা কাজ পড়ে গেছে। আম্মাজিকে বলে দিও আমি বাইরে গেছি। ঠিক আছে?"
"আচ্ছা" ফারহানার চোখে সন্দেহ। ও এখনো চিন্তা করছে। "আমি কিছু বুঝতে পারছি না। কিন্তু সাবধানে থেকো ফারাজ।"
আর কোন প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ফারাজ জ্যাকেট নিয়ে নিচে নেমে গেলো। সে গেট থেকে বের হওয়ার সাথে সাথে স্ক্রুজের গাড়ি এসে থামলো। চারিদিকে শুধু একবার তাকিয়ে ফারাজ গাড়িতে উঠে গেলো।
রান্নাঘরের জানালা দিয়ে ফারহানা পুরো ঘটনা দেখলো। তার চোখের পানি চাঁদের আলোয় জ্বলজ্বল করছে।
গাড়ির মধ্যে সবাইকে চিন্তিত মনে হচ্ছে। আগেরদিন বিকালের আনন্দ সবার মুখ থেকে মুছে গেছে। কেউ কোন কথা বলছে না। ওরা ইস্টসাইড স্টেট এ পৌঁছানোর পর স্ক্রুজ দুই ব্লক পিছনে গাড়ি থামালো।
"ওই যে ওই বাড়িতে ওরা সবাই মিলে পার্টি করছে...।"
স্ক্রুজ রাস্তার পাশে ছোট্ট একটা বাড়ি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো। জানালা দিয়ে মলিন আলো দেখা যাচ্ছে।
"এরা সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে। সবাইকে রাস্তায় নিয়ে আসার সময় এসে গেছে। দেখিয়ে দিতে হবে এখানে কার রাজত্ব চলে।" স্ক্রুজ ফারাজের দিকে তাকালো। "তুমি মাজকে সামলাতে পারবে? নাকি আমাকে হাত লাগাতে হবে?"
ফারাজের মনে হলো সে অজ্ঞান হয়ে যাবে। 'সামলানো' বলতে স্ক্রুজ কী বোঝাচ্ছে? এরা তাকে কী করতে বলছে?
"আমম.. আমিই পারবো" সে যথাসম্ভব জোর দিয়ে বললো।

"ঠিক আছে তাহলে। মো গাড়ির মধ্যে থেকে জিনিসগুলো নিয়ে আসো।"
মো বাধ্য ছেলের মত বাইরে বের হয়ে গাড়ির ট্রাংক খুললো। কিছুক্ষণ পর সে যখন ফিরে আসলো তার হাত ভর্তি বেসবল ব্যাট, লাঠি আর বড় বড় ছুরি। চাঁদের আলো লেগে ছুরির ধারালো অংশ চকচক করছে। মো একটা ব্যাট ফারাজের দিকে ছুঁড়ে দিলো। স্বাভাবিকভাবেই এখনি ওর হাতে ছুরি দেওয়া যাবে না।
"তো আমরা তাহলে ভিতরে গিয়ে ভালো মত শিক্ষাটা দিয়ে আসি। শুধু একটু বুঝিয়ে দেবো। আর কিছু না। আর মাজের দায়িত্ব ফারাজের। চলো।"
ফারাজের পুরো মাথা ফাঁকা হয়ে গেছে। সব ট্যাটু করা আর লেদার জ্যাকেট পরা গুন্ডাদের মাঝখানে সেও একটা দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।
ওরা গেটের কাছাকাছি যাওয়ার সাথে সাথে একটা মেয়ে ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো। ওর পিছন পিছন ঢোলা জিন্স পরা একটা এশিয়ান ছেলেও দৌড়ে আসছে।
"হেই! এদিকে আসো" ছেলেটা ডাক দিলো। ওর কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। মেয়েটা হাসতে হাসতে দৌড়ে আসছে।
গেটের কাছে পৌছে মেয়েটা প্রচণ্ড জোরে চিৎকার করে উঠলো। এশিয়ান ছেলেটা কিছুক্ষণ থেমে ঘটনা বোঝার চেষ্টা করলো। সে মাথা উঁচু করে এগিয়ে এলো। ছেলেটা মাজ ছিলো।
কুয়াশা আর মদের ঝোকে সে দেখছে কয়েকজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। সবাই আকৃতিতে বেশ বড়। মনে হয় সংখ্যায় ছয়জন হবে। আর সবচাইতে অদ্ভুত ব্যপার সবাইকে অনেক চেনা লাগছে। সবার হাতে অস্ত্র। সবচাইতে বড় জনের হাতের ছুরি দেখে মাজের নেশা ছুটে গেলো। সে গালাগালি দিতে দিতে আবার ঘরে ঢুকে গেছে।
"ধর ওকে!" ব্রুজ গর্জন করে উঠলো। বাকিরা সবাই একসাথে বাগানের ভিতর দিয়ে সব ধ্বংস করতে করতে এগিয়ে গেলো। একদিকে মেয়েটা চিৎকার করছে আর অন্যদিকে মাজ প্রাণপণে দরজা বন্ধ করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। সে তার বন্ধুদের ডেকেই যাচ্ছে। কিন্তু গান আর হাসির মাঝখানে

তার কথা কেউ শুনতে পেলো না। শুধু ফারাজ আর বন্ধুরা লাথি দিয়ে দরজা ভাঙার পরই সবার হুঁশ ফিরে এলো।
কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়িটা জঞ্জালে পরিণত হলো। ছোট ছোট জামাকাপড় পরা মেয়েরা চিৎকার করতে করতে এদিক ওদিক ছুটে যাচ্ছে। স্কুজের দল সামনে যা পাচ্ছে যেমন টেবিল, বোতল, মানুষ সব ভেঙে ফেলছে।
ফারাজকে সবাই প্রায় ঠেলে ঘরের ভিতর নিয়ে এসেছে। একটু পর সে মাজকে নিজের সামনে দেখলো। ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেছে। ফারাজের ভিতরে যেন পিশাচ জেগে উঠলো। ওর একে একে সব মনে পড়ছে। কীভাবে ওর আঁকা সুন্দর ছবিটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। সব চড়, ঘুষি, লাথি, গালাগালি আর ওর ফোন।
ফারাজ অজান্তেই হাতের ব্যাট উঁচু করে ধরলো।
বাতাসে ভেসে থাকা ব্যাট ধীরে ধীরে নিচে নেমে আসছে।
একসময় কাঠের ব্যাট মাজের হাড় মাংসের সাথে এসে লাগলো।
ফারাজ চোখের সামনে মাজকে মেঝেতে পড়ে যেতে দেখলো।
ও এখনো ভাঙা হাড় আর বুকের ভিতরে হাতুড়ি পেটার শব্দ শুনতে পাচ্ছে।
তারপর পুরো রুম নিস্তব্ধ হয়ে গেলো। ফারাজকে ওর সাথের লোকেরা প্রায় তুলে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। ওরা পিছনে একটা যুদ্ধক্ষেত্র রেখে যাচ্ছে। আনন্দে কয়েকজন চিৎকার করে উঠলো।
ফারাজ কাঁপছে। প্রচণ্ড কাঁপছে। সবাই ওর বাহাদুরির জন্য প্রশংসা করছে। ফারাজ অনেক কষ্টে হাসার চেষ্টা করলো। ও ভাবেনি মাজ আর কখনো ওর সাথে ঝামেলা বাঁধাতে আসবে।

যখন সে বাড়ি ফিরলো ফারহানা আজ আর অপেক্ষা করে ছিলো না। ফারাজ গোসল করে একা একা নামাজ পড়ার চেষ্টা করলো। কিন্তু ও কিছুতেই মন বসাতে পারছে না। সে বুঝতে পারছে না তার সাথে কী হচ্ছে।

সেই রাতে ফারাজ আবার আগের স্বপ্ন দেখলো। অচেনা শহর, সামনের সব রাস্তা উপরে উঠে যাচ্ছে। একটা সময় সে আকড়ে ধরার মত আর কিছু খুঁজে পাচ্ছে না। ওর নখ ভেঙে রক্ত বেরিয়ে গেছে। আঙুলের মাথা কেটে কেটে যাচ্ছে। রাস্তার পিচের সাথে ঘষা লেগে হাঁটু ছড়ে যাচ্ছে। সারা শরীর ঝাঁকুনি দিয়ে উঠছে। আর তারপর ঘন কালো অন্ধকার তাকে গ্রাস করতে এগিয়ে এলো। তার চারিদিকের সব আলো, সব বাতাস অন্ধকার গিলে ফেলছে। সে প্রাণপণে নিশ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করছে।

পঞ্চদশ অধ্যায়
প্রতিশোধ

ফারহানা ফজরের নামাজের জন্য ফারাজের ঘুম ভাঙানোর অনেক চেষ্টা করলো কিন্তু ফারাজ মরার মত ঘুমাচ্ছে। একটা সময় ফারহানা একাই নিচে নেমে গেলো। না হলে সেও নামাজ পড়তে পারবে না ।
যখন ফারাজ অনেক পরে উঠে জিজ্ঞাসা করলো, "সাহ্‌রীর সময় কি শেষ?"
ফারহানা রেগে গেলো।
"অবশ্যই শেষ ফারাজ! তুমি কাল কখন বাড়ি ফিরেছো? আর গিয়েছিলেই বা কোথায়?"
ফারাজের প্রচণ্ড মাথা ব্যাথা করছে। সে বোনের প্রশ্নকে পাত্তা দিলো না।
"এইতো একটু বাইরে ছিলাম।"
"ব্রুজের সাথে?"
ফারাজ অন্যদিকে তাকিয়ে বললো,"হ্যাঁ। আমাদের একসাথে কিছু কাজ ছিলো।"
"কাজ? কিসের কাজ? আর তুমি আবার এদের সাথে ঘুরছো মানে কি? আমি তো ভেবেছিলাম তুমি এসব বাদ দিয়ে ভালো হয়ে গেছো। নিজেকে বদলানোর চেষ্টা করছো...।"
ফারাজ ফারহানার দিকে ফিরলো। ওর মুখ রাগে লাল হয়ে গেছে। "তুমি কি বোঝো! এসব থেকে বের হয়ে আসা মুখের কথা না! শোন আমাকে আর জ্ঞান দিতে এসো না। আমি জানি আমি কী করছি। নিজের চরকায় তেল দাও। আর আমাকে নিয়ে ভাবতে হবে না!"
"তোমাকে নিয়ে ভাববো না?" ফারহানার গলা কাঁপছে। ও ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেছে। অনেক বছর ওদের কোন ঝগড়া হয় না। ওরা উঁচু স্বরে একে অন্যের সাথে কথা বলে না। ফারহানার সবকিছু অচেনা লাগছে। রমজানে তারা দুজনে কতটা কাছাকাছি চলে এসেছিলো। আর এখন এসব কী হচ্ছে। ফারহানা কষ্ট পাচ্ছে। ফারাজ তাকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। তার জন্য কষ্ট হচ্ছে তার।

ফারহানা চোখের পানি ধরে রাখাতে পারছে না। "ঠিক আছে" সে ধীরে বললো, "তোমাকে নিয়ে ভাববো না।" তারপর রুম ছেড়ে চলে গেলো। ওর কালকে একটা প্রেজেন্টেশন জমা দিতে হবে।
ফারাজ রাগ সামলানোর চেষ্টা করলো। ফারহানা কীভাবে বুঝবে ফারাজকে কী কী করতে হচ্ছে? না জেনেশুনে ও এসব কথা বলে কীভাবে? ওর জীবনে তো কোন সমস্যা নে। কোনও দিন ছিলোও না। ফারহানা কখনো প্রতিবাদ করতে ভয় পায় না। যা ঠিক মনে করে মুখের উপর বলে দেয়। ফারাজ কোনও দিন তার মত সাহসী হতে পারবে না।
আর নিজের এই দূর্বল স্বভাব আজ তাকে এক গভীর খাঁদে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এমন এক জায়গায় যেখানে সে অন্য মানুষ হয়ে যায়। এমন সব কাজ করতে বাধ্য হয়, যেগুলো সত্যিকারের ফারাজ কখনো করবে না।
কিন্তু আমি কীভাবে এর থেকে মুক্তি পাবো? কীভাবে?
তার মাথায় সারাদিন এই প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে লাগলো। আর তারপর ইংরেজি হোমওয়ার্ক না করার জন্য তাকে শাস্তি পেতে হলো।

□

"ফারাজ" স্ক্রুজ ঐদিন রাতে বললো, "এখন সময় এসে গেছে তোমাকেও তো কিছু টাকা পয়সা জোগাড় করতে হবে।"
ওরা একটা ফাঁকা রাস্তার পাশে স্ক্রুজের ধোঁয়া ভর্তি গাড়িতে বসে ছিলো।
"দলের একজন হতে গেলে তোমাকে তো নিজেও ইনকাম করতে হবে। বুঝেছো? তুমি আমাকে দেখবে। আমি তোমাকে দেখবো। সহজ হিসাব। এখানে আমরা একটা ভাষাই বুঝি সেটা হচ্ছে টাকা। টাকা মানে ক্ষমতা। আর তুমি যদি টাকাওয়ালাদের নিয়ন্ত্রণ করো, তাহলে সব ক্ষমতা তোমার হাতে। মাজের মত গবেটগুলো ভাবে ওরাও নিজেদের জায়গা বানাতে পারবে। কিন্তু গাধাগুলো জানে না, আমি ক্ষমতার ভাগ কাউকে দেই না। হয় সব আমার হাতে থাকবে। নয়তো ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু এখন আমার আর কিছু নিয়ে ঝামেলা করতে ইচ্ছা করছে না। সব ঠিকঠাক চলুক। তুমি আমাকে এভাবে চালাতে সাহায্য করবে তো তাই না?"

সে হাতের চাইতে বড় পাঁচটা প্লাস্টিকের প্যাকেট বের করে আনলো। দুইটা বাদামি আর তিনটা সাদা। হেরোইন আর কোকেন।
"তুমি প্যাকেটগুলো এই ঠিকানায় একটু দিয়ে এসো...।"
ফারাজ হা হয়ে গেলো। স্ক্রুজ তাকে কী করতে বলছে? তাকে ড্রাগস পাচার করতে হবে?
"পুলিশগুলো ইদানীং বড্ড বেশি চালাক হয়ে গেছে। আমাকে সন্দেহ করা শুরু করছে। কিন্তু আমার কাছে কোনদিন ড্রাগস পাবে না। কেন? কারণ আমি নিজের হাতে ময়লা লাগাই না। আমার হয়ে তোমার মত সুন্দর ছেলেরা কাজগুলো করে দেয়। আর যখন টাকা আসবে তুমি তার থেকে একটা ভাগ পেয়ে যাবে।"
ফারাজ ভয়ে ভয়ে চারিদিকে তাকালো। তার বুকের মধ্যে ধপাস ধপাস শব্দ হচ্ছে। বাকিরা সবাই তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। সে কী বলে শোনার অপেক্ষা করছে।
"না!" ফারাজের ভিতরে চিৎকার দিয়ে উঠলো। কিন্তু সে মুখ খুলে আবার বন্ধ করে ফেললো।
"ভালো ছেলে" স্ক্রুজ বাঁকা হাসি দিয়ে বললো, "তুমি ঠিক থাকলে আমিও ঠিক। বুঝেছো? তুমি তো জানো ইজ্জত কী জিনিস। তাই না? তোমার সম্মান, মর্যাদা। এখন এটাই তোমার ইজ্জত। এই রাস্তার আসল ইজ্জত।"
তারপর স্ক্রুজ ফারাজের দিকে ঝুঁকে এলো। এতটা কাছে যে ওর গায়ে সিগারেটের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। চোখের লাল দাগ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।
"আর ভালোভাবে মাথায় ঢুকিয়ে নাও ফ্রাজ" স্ক্রুজ কোমল স্বরে বললো, "আমার উপর দিয়ে কেউ কথা বলে না। কেউ না। আমি ডাকলে তুমি আসবে। আমি কোথাও পাঠালে তোমাকে যেতে হবে। আমি চাইলে তোমাকে সেই কাজ করতে হবে। আর যদি কাজ না করতে চাও, এমন সময় কাজ করানোর এমন পদ্ধতি আছে আমার কাছে যে তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। " তারপর সে নিজের সিটে বসে আরেকটা সিগারেট ধরালো। "কিন্তু এখন ওসব নিয়ে তোমার ভাবা লাগবে না...।"

ফারাজ ঢোক গিললো। ওর বুকের মধ্যে হাতুড়ি পেটানো হচ্ছে। গলা শুকিয়ে গেছে। সে মাথা নাড়ালো। নাহ এখন ওর ওসব নিয়ে ভাবতে হবে না।

□

পরের দুই সপ্তাহ ফারাজের জন্য ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের মত কাটলো। যতোবার নতুন মোবাইলে কল বেজে উঠেছে, তার আত্মা কেঁপে উঠেছে। এই নাম্বার শুধু স্ক্রুজ আর পরিবারের লোকের কাছে আছে। বাবা ফারাজকে খুবই কম ফোন করেন। আর ফারহানা এখনো রেগে আছে। তাই স্ক্রুজই ফোন করে তাকে স্কুল শেষে দেখা করতে বলেছে।
স্ক্রুজের কালো বিএমডব্লিউতে ওঠার পর প্রতিদিন কিছু না কিছু কাজ থাকতো। হয়তো কাউকে উচিত শিক্ষা দেওয়া। নয়তো চুরি করা জিনিস অন্য জায়গায় পৌঁছে দেওয়া। ড্রাগস সাপ্লাই করা। সাদা প্যাকেট আর বাদামি প্যাকেট। এই কাজগুলো কখনো তাকে একা করতে হয়। কখনো অন্য কারো সাথে। আর শুধু টাকা, টাকা আর টাকা। টাকা আদায় করো। ভাগাভাগি করো আর উড়াও। প্রথম প্রথম ফারাজের বিবেক তাকে বাঁধা দিতো। যখনি সে সাহ্‌রীতে উঠতে পারতো না, সে ঘুম থেকে উঠে দেখতো চারিদিক আলো আলো হয়ে গেছে। সে আজও নামাজ পড়তে পারেনি। তার বুকের মধ্যে যেন ব্যথা ব্যথা অনুভূত হতো। অনেকদিন স্ক্রুজের লোকেদের সাথে বাইরে ঘোরার সময় তার তারাবীর নামাজের জন্য মন কাঁদতো। যে প্রশান্তি সে তারাবীর নামাজে পেয়েছে; তা যেন এখন ধরা ছোঁয়ার বাইরে।
শুধু তাই না সে যে পরিমাণ হারাম কাজ করছে বা চোখের সামনে দেখেছে, সব তার বুকে তীরের মত বিঁধেছে। কিন্তু ধীরে ধীরে এসব কিছু স্বাভাবিক হয়ে গেছে। ফারাজ এখন স্ক্রুজের জগতে বাস করে।
রমজানের শুরুতে যা কিছু তাকে সব খারাপ থেকে দূরে ঠেলে রেখেছিলো, আজ তার অজান্তেই তাকে ছেড়ে চলে গেছে। সে কতগুলো রোজা ভেঙেছে তার হিসাবও নেই।

এখন আর নিজের প্রতি বিতৃষ্ণাও আসে না। বাস্তব পৃথিবী এমনই হয়। সে তো আর কোন সাধু সন্ন্যাসীর জগতে বাস করে না। তাছাড়া মাজ আর ওর দলের লোকজনের সাথে মারামারির পর স্কুলে তার সম্মান অনেক বেড়ে গেছে। কীভাবে বিধ্বংসী ফারাজ আর তার দলের লোকেরা মাজের দলকে পুরো আধমরা করে দিয়েছে সেই গল্প এখন সবার মুখে মুখে। আর যারা বিশ্বাস করেনি, তাদের জন্য প্রমাণস্বরূপ মাজের মাথার বিশ্রী কাটা দাগ তো আছে।

সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে মাজ এখন পরাজিতের মত সব সময় মাথা নিচু করে রাখে। কিন্তু ফারাজ ওর চোখে নিজের জন্য ঘৃণা দেখেছে। তাকে দেখে মনে হয় সে যেন দিন গুনছে।

আজ ওদের কাজ তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেছে। আর স্ক্রুজও খোশ মেজাজে আছে। যেহেতু সন্ধ্যা হতে এখনো এক ঘণ্টা বাকি আছে, স্ক্রুজ সবাইকে নিয়ে পার্কে যেতে চাইলো। "হাহ্! কতো বছর পার্কে আসিনি!"

পার্কের পরিবেশের সাথে ওদের ঠিক মানাচ্ছে না। বাচ্চাদের সাথে খেলা করা সব মায়েদের মধ্যে কালো হুডি পরা একদল এশিয়ান ছেলে। ওরা পার্কের এক কোণায় গিয়ে বসলো। যদিও জায়গাটা শহরের মাঝখানে; কিন্তু বেশ নির্জন। আশেপাশে তেমন কেউ নেই।

"আমরা পাকিস্তানিরা অদ্ভুত তাই না?" স্ক্রুজ হঠাৎ সিগারেট টানতে টানতে বললো। "তোমরা দেখো, আমাদের দাদারা এই শহরে এসেছিলেন। অনেক পরিশ্রম করে ছোট ছোট ব্যবসা দাঁড় করিয়েছেন। ছেলেমেয়েদের ভালোভাবে পড়াশোনা করিয়ে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার বানিয়েছেন। আমাদের বাবা মায়েরা এইসব নিয়ম কানুন চুপচাপ মেনে নিয়ে পড়ালেখা করেছে। সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তারা কোনও দিন বুঝতে পারেনি এই সমাজ তাদের কখনো আপন করে নেবে না। কোনও দিন তারা এদের একজন হতে পারবে না।

"এই সমাজ বর্ণবাদী। বর্ণবাদ এর শিরায় শিরায় প্রবেশ করেছে। যদিও কেউ ভালো কোন অবস্থায় চলে যায় তাতেও কিচ্ছু এসে যায় না। এরা আমাদের ঘৃণা করে। সব উপায়ে আমাদের দমিয়ে রাখার চেষ্টা করবে।

আমাদের স্কুল থেকে বের করে দেয়। জেলে আটকে রাখে। খামোখা সন্দেহের বশে নানাভাবে আমাদের পিছনে লেগে থাকে। কিন্তু এরা জানে না, আমাদের মত ছেলেরা এদের এই সস্তা চাকরি আর জীবন চায় না।
"আমরা ওদের এতটা ভয়ে রাখবো যে, আমাদের এলাকায় ঢুকতে দু'বার ভাববে। ওখানে আমাদের রাজত্ব চলে। আমাদের জায়গায় কেউ কিচ্ছু করতে পারবে না... ।" সে সামনের মাঠের দিকে তাকিয়ে আরো জোরে সিগারেট টানতে লাগলো।
"আমার মা আমাকে এই পার্কে নিয়ে আসতো" সে যেন নিজেকেই বললো, "মা এখন আমাকে বুঝবে না। তার ইচ্ছা ছিলো আমিও বাকিদের মত ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হবো। যখনই আমার কানের কাছে চাকরি নিয়ে ঘ্যানঘ্যান করতে আসে, আমি টেবিলের উপর এক বান্ডিল টাকা রেখে দেই। মাও আমাকে জিজ্ঞাসা করে না আমি কোথায় টাকা পেলাম? আমিও কোনদিন বলতে যাই না। তার এসব জানার কোন দরকার নেই।"
"আর তোমার বাবা?" ফারাজ জানতে চাইলো।
"আমি ছোট থাকতেই আমার বাবা মায়ের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। বাড়ির কর্তা এখন আমি। আর মা এটা ভালো মত জানে। যতক্ষণ ঘরে টাকা আছে আর আমার ভাইবোনগুলো লাইনে আছে, মা আমার ব্যপারে মাথা ঘামাবে না।"
"মানে?"
এই প্রশ্নে স্ক্রুজের চেহারা পাল্টে গেলো। ফারাজের মনে হলো তার এ কথাটা জিজ্ঞাসা করা উচিৎ হয়নি। কিন্তু স্ক্রুজ কথা বলতে লাগলো। আজ হয়তো তার গল্প করতে ভালো লাগছে।
"আমার ভাই বোনেরা সব লাগাম ছাড়া হয়ে গেছে। কেউ মাকে কোন সম্মান দেয় না। এদেরকে আমার সামাল দিতে হয়। মাঝে মাঝে উল্টাপাল্টা কাজ করলে দুই একটা চড় থাপ্পড় দেই। আমার বোনের কথাই ধরো, মাত্র আঠারো বছর বয়স কিন্তু ভাবে পুরো দুনিয়া বুঝে ফেলেছে। একদিন একটা ছেলের সাথে ধরে ফেলেছিলাম। পরে অবশ্য ছেলেটাকে একদম সোজা করে দিয়েছি। তাই না বন্ধুরা?"

বাকিরা সবাই তালি দিয়ে হেসে উঠলো।
স্ক্রুজ মাঠ থেকে একটা ঘাস ছিঁড়ে চাবাতে চাবাতে বলতে লাগলো, "সোনার চান্দু! ভেবেছে আমার বোনের সাথে ফাজলামো করে পার পাবে।"
"নাহ গুরু!" ইমতি বললো, "আমার বোনের সাথে কেউ কিছু করতে আসলে তার খবর আছে। এই অসম্মান মেনে নেওয়া যাবে না।"
সবাই মিলে তুমুল আলোচনা শুরু করে দিলো। ওদের কথার মাঝাখানেই নাটালি আর বান্ধবীকে হেঁটে আসতে দেখা গেলো। ওরা পিছনের কোন এলাকা থেকে আসছে। নাটালি হেসে হাত নাড়ালো। স্ক্রুজ একটা শিস দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিলো। "আমার সস্তা মেয়েগুলোকে একদম ভালো লাগে না" সে বিড়বিড় করে বললো।
ফারাজ চুপ করে রইলো। কিছুদিন আগেই তো স্ক্রুজ আর তার বন্ধুদের এই মেয়েদের ভালোই পছন্দ ছিলো।
নাটালি যখন দেখলো তাকে পাত্তা দেওয়া হচ্ছে না, সে মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে চলে গেলো।
কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে স্ক্রুজ আবার কথা বলতে শুরু করলো। "এই জন্যই আমি পাকিস্তানি মেয়ে বিয়ে করবো। বাকিদের চরিত্রের একদম ঠিক নেই। বিয়ে যদি করতে হয় এমন মেয়ে বিয়ে করবো, যার সাথে আগে কারো সম্পর্ক ছিলো না। একদম শান্ত ও ভদ্র।"
"একদম ঠিক!" মো জোর গলায় বলে উঠলো। "এইসব রাস্তার মেয়েদের জালে আমি ফাঁসছি না! আমার টাকা লাগবে, টাকা!"
সবাই একসাথে হেসে ফেললো। সবাই জানে মো কতো কৃপণ। ফারাজও ওদের সাথে তাল মিলিয়ে হাসছে। কিন্তু সে মাথা থেকে এদের অদ্ভুত যুক্তি কিছুতেই দূর করতে পারছে না। এরা কি জানে, এটা কতটা বিদ্রূপাত্মক!

ষোড়শ অধ্যায়
সন্দেহ ও বিশ্বাস ঘাতকতা

ফারহানা স্বীকার করুক বা না করুক সেও ভাঙতে শুরু করেছে। সে নিয়মিত রোজা রাখছে। কিন্তু তার আলাদা কোন অর্থ নেই। তার নামাজও শুধু একটা রুটিন হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি করে শেষ করতে পারলেই যেন বেঁচে যায়। সে ধর্মীয় কোন কাজকর্মে মন বসাতে পারছে না। মায়ের সাথে ঝগড়া করতে করতে সে ক্লান্ত। ক্রমাগত ফারাজের জন্য তার দুশ্চিন্তা হয়।

"আমার ওর জন্য খুব ভয় হয় ফুফু" সে গতকাল গোপনে নাজমা ফুফুকে বলেছে। "ও আবার বাজে ছেলেগুলোর সাথে মেশা শুরু করেছে। ওরা একদম ভালো না। আমি জানি।"

"বুঝতে পারছি" নাজমা ওর সাথে একমত। "ওর সাথে আজকাল কথা বললে বোঝা যায়। কেমন একটা ছাড়া ছাড়া ভাব। ওর সাথে কি আর্ট প্রজেক্টের ওই ভাইদের আর যোগাযোগ হয়েছে?"

"ওহ্, ঐটা? ফারাজ এখন ওই বিষয়ে কোন কথাই বলে না। মনে হয় যেন ও বাক্স বন্দি হয়ে গেছে। আমাকে কিছু বলে না।"

"হুমম, আমাকে কিছু একটা করতে হবে...।"

"আমি আপনার জায়গায় থাকলে এখন দূরে থাকতাম। আম্মাজি ইদানীং আপনাকে ঠিক পছন্দ করেন না।"

"ভাবী তাহলে এখনো তোমার হিজাব পরা মেনে নিতে পারেনি?"

"একদম না। আর মায়ের মতে সব দোষ আপনার। আমাকে তো আপনার থেকে দূরে থাকতে বলেছে।"

"মানে আমার সাথে দেখা করা নিষিদ্ধ?"

"প্রায় তাই। যদি মা শোনে আপনি আমাকে কোথাও দেখা করতে বলেছেন। কিংবা আমরা একসাথে কোথাও যাচ্ছি, তাহলে হঠাৎ করে কোথেকে জানি একগাদা কাজ চলে আসে। আর এখন তো ওই ইংরেজের কথা শোনার পর থেকে অবস্থা আরো খারাপ হয়ে গেছে...।"

"ওহ্, এই ঘটনার কথা তুমি জানো?" তারপর নাজমা ফুফুর কণ্ঠস্বর পাল্টে গেলো। "শোন ফারহানা! আমি চাই না তুমি খামোখা কোন জিনিস নিয়ে চিন্তা করো। বুঝেছো? সবকিছু আল্লাহ্‌র হাতে। তাই কিছু নিয়ে দুশ্চিন্তা করবে না। শুধু মনোযোগ দিয়ে ইবাদাত করবে, আর মাকে সম্মান করবে। তাকে রাগিয়ে দিও না। আমরা কোন একটা সমাধান বের করবো ইনশাআল্লাহ্। যাও এখন গিয়ে কাজ করো তাহলে।"

"ফুফু?"

"হ্যাঁ মা?"

"আমম কিছু না। এমনিতেই...।"

"তুমি ঠিক আছো?"

"হ্যাঁ একদম। সব ঠিক আছে...।"

কিন্তু সব ঠিক ছিলো না। ফারহানার হিজাব এখন ভারী মনে হয়। যেন অসম্ভব রকমের ভারী। তার মা যখন তাকে হিজাব নিয়ে প্রশ্ন করতো, যেন সে কোন অপরাধ করে ফেলেছে। কিংবা চরমপন্থী হয়ে যাচ্ছে। তখনো তার এত খারাপ লাগেনি। যখন জেনেছে সে আর স্কুলের সবার আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু না। তখনো কিছু মনে হয়নি। মেয়েদের অনেকে যখন হিজাব পরার জন্য তার প্রশংসা করেছে, তাকে নিয়ে গর্ব করেছে; তখনো তো হিজাব এতটা ভারী ছিলো না।

এখন সব অদ্ভুত লাগে। একটা সময় হিজাব ফারহানাকে মানসিকভাবে শক্ত আর একাগ্র হতে সাহায্য করেছে। ছেলেরা যখন তার দিকে দ্বিতীয়বার ঘুরে তাকায়নি, সে খুশি হয়েছে। তার ভালো লেগেছে যে কেউ তাকে ডেকে নাম্বারের জন্য বিরক্ত করেনি। তার চুল, চোখ, মুখ নিয়ে প্রশংসা করতে আসনি।

এখন ওরা চোখ নামিয়ে নেয়। সালাম দেয়। ছোটবেলা থেকে তাদের এই শিক্ষা দিয়েই বড় করা হয়েছে। এই পোশাক যে ওদের মায়েদের পোশাক।

তাহলে কেউ সম্মানের চোখে দেখলে এমন লাগে। এসব ভেবেই ফারহানা মন প্রশান্তিতে ভরে যেত। সে এরকম একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য গর্বিত ছিলো।

কিন্তু আজকাল তার সেই আত্মবিশ্বাস চলে গেছে। এখন ছেলেরা তার মুখ থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে রবিনার চকচকে চুল আর বাঁকা হাসির দিকে তাকালে আর ভালো লাগে না। তার নিজেকে ছোট মনে হয়। সবাই জানে সে রবিনার চেয়ে দশগুন বেশি সুন্দর।

একটা সময় সবার আলোচনার মাঝখানে সে থাকতো। কিন্তু এখন সবাই তাকে আলাদা করে দিয়েছে। আরো বেশি এটা হচ্ছে কারণ সে নতুন ফ্যাশনেবল হিজাবি হয়নি। কিছু মেয়েরা জিন্সের সাথে স্কার্ফ পরে। কিংবা স্কার্ট আর হাঁটু পর্যন্ত বুট পরে। সাথে নানা রকম গয়না আর মেকাপ। যদিও ফারহানা ওদের মত হতে চায় না। কিন্তু তারপরও ওদের স্মার্ট চলাফেরা দেখে তার হিংসা হয়।

"এদের জন্য আলাদা নাম আছে জানো তো!" ফারহানাকে এরকম কয়েকটা মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে সাজিয়া বলেছিলো।

"হো-জাবিস" সাজিয়া মুখ যতটা সম্ভব বাঁকা করে বললো।

"কী?" ফারহানার অবাক লাগছে, "তুমি সত্যি বলছো! এটা একদম উচিৎ না!" ফারহানা ওই মেয়েদের একজনের দিকে তাকালো। মেয়েটা তার কোমরের মোটা বেল্ট ঠিক করছে। তার পায়ে পেন্সিল হিল। "এক হিসাবে অবশ্য ঠিকই...।" সে আর সাজিয়া হেসে ফেললো।

"কিন্তু তারপরও। ওরা চেষ্টা তো করছে তাই না?"

"হ্যাঁ, কিন্তু আমার বাবা বলেন এটা পর্দার মধ্যেই পড়ে না।" সাজিয়া বললো। "শুধুমাত্র মাথা ঢেকে রাখা মানেই কিন্তু তুমি শালীন পোশাক পরে নেই।"

"কিন্তু তোমার বাবা কি ওদের চুল দেখাতে বলবেন?"

"আমি কয়েকবার বাবাকে এটা জিজ্ঞাসা করার চেষ্টা করেছি। উনি শুধু বলেন, ইসলামের কাছে তোমাকে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করতে হবে। কোন জিনিস অর্ধেক পালন করার নিয়ম নেই"।

“তোমার বাবার কথা শুনলে আরো মন খারাপ হয়ে যায়, তাই না? মনে হয় হাজার চেষ্টা করলেও পুরোপুরি একজন ভালো মুসলিম হওয়া সম্ভব না।”

“ঠিক তা না” সাজিয়া জবাব দিলো। “উনি যেহেতু একজন ইমাম, তাই উনি অনেক ভালোভাবে কুরআন পড়েছেন। আর অনেকের চাইতে অনেক কিছু সম্পর্কে ভালো জানেন। ওনার জন্ম এখানে হয়নি। তাই উনি জানেন না, আমাদের সমাজে বড় হওয়া কতোটা কঠিন। চারিদিকে নিষিদ্ধ জিনিস আমাদের কীভাবে ডাকে। ওনার চোখে সব সাদা কালো। আমি জানি উনি বেশিরভাগ সময় ঠিক কথা বলেন। কিন্তু আমারো ইচ্ছা করে একবার আমার জায়গায় দাঁড়িয়ে উনি দেখুন। আসলে সব সময় সঠিক কাজ করা কতোটা কঠিন।”

“আর তোমার মা কী বলেন? উনি কখনো তোমার বাবাকে এসব জিনিস নিয়ে বোঝান না?”

সাজিয়া হাসলো, “মা তো সবসময় বলে যাচ্ছেন! জুনায়েদ! “তুমি জানোনা এখনকার ছেলেমেয়েরা কেমন!”

বাবা শুনে শুধু হাসেন আর আমাকে বলেন, “ইসলাম কারো জন্য বদলায় না মা! তোমাকে শুধু অটল থাকতে হবে।” তারপর উনি আমাকে জড়িয়ে ধরেন। আর আমি কেঁদে ফেলি। বাবা যেমন চান, আমি সেভাবেই নিজেকে গড়ে তুলতে চাই। কিন্তু সবকিছু মেনে চলা এত কঠিন!”

“আমি জানতাম হিজাব আজীবনের জন্য। কিন্তু আমি বুঝিনি এটা এতটা কঠিন হবে...।”

“তোমার কাছে এখন কঠিন মনে হচ্ছে?” সাজিয়া কোমল স্বরে জিজ্ঞাসা করলো।

ফারহানা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। সে কখনো এসব নিয়ে কথা বলেনি। সাধারণত সাজিয়া তার ভয়, হীনমন্যতা নিয়ে কথা বলে। আর ফারহানা এতদিন শুধু সান্ত্বনা দিয়ে এসেছে।

“আমার ওর জন্য অনেক কষ্ট হয়” ফারহানা আস্তে করে বললো।

“কে মালিক?”

ফারহানা মাথা নাড়ালো। "মনে হয় যেন সব সময় ভিতর থেকে কেউ বলছে, আমি যদি হিজাব না পরতাম তাহলে এখন আমরা একসাথে থাকতাম।"

"কিন্তু ফারহানা! তুমি তো হিজাবের কারণে ওকে ছেড়ে আসোনি। তোমার কি মনে নেই?"

ফারহানার সেই জঘন্য সকালের কথা মনে পড়ে গেলো। যেদিন রবিনা এসে মালিক আর এক মডেলের গল্প তাকে বলেছিলো।

ফারহানার চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগলো। "হ্যাঁ তুমি ঠিক বলছো...। আমি মালিককে যেমন ভেবেছিলাম ও তা না। সে আমাকে মিথ্যা বলেছে...।"

ওরা দুজনেই কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে রইলো। তারপর সাজিয়া কথা বললো, "কিন্তু ফারহানা! তোমার এমন কেন মনে হচ্ছে? আমার সবসময় তোমাকে অনেক দৃঢ় চরিত্রের মনে হয়েছে। এত অল্পতে তুমি ভেঙে পড়বে ভাবিনি। তুমি জানো তো তুমি কেমন। একবার যদি ঠিক করে ফেলো কিছু করবে, তাহলে তোমাকে কেউ ফেরাতে পারে না।"

"আমি জানি সাজ! আমি জানি। এইজন্যই তো আমি বুঝতে পারছি না। আমার সাথে এমন কেন হচ্ছে। আমি মানসিকভাবে অনেক দূর্বল হয়ে গেছি। যেন সবকিছুতেই আমি ক্লান্ত। আমি জানি না আর কতোদিন এভাবে চলতে পারবো।"

সাজিয়া তার বান্ধবীকে জড়িয়ে ধরলো।

"তোমার ঈমান দূর্বল হয়ে গেছে। তুমি কি তোমার নাজমা ফুফুর সাথে এ বিষয়ে কথা বলেছো?"

"আসলে সাজ! উনিও পরিবারের সাথে নানারকম ঝামেলার মধ্যে আছেন। তাই আমি হিজাব আর মালিককে নিয়ে কিছু বলিনি।"

"ও উনি কি এখনো ওই ইংরেজ লোকটাকেই বিয়ে করবেন ঠিক করেছেন?"

"আমি ঠিক জানি না। আমার দাদী একেবারেই রাজী নন। কিন্তু আমার ছোট কাকা হয়তো রাজী আছেন...।"

“সত্যি? আমার তো ওনাকে অনেক কঠিন স্বভাবের মনে হয়েছিলো...”

“হ্যাঁ, কিন্তু নাজমা ফুফু ওনার ছোট বোন। আর উনি ফুফুকে অনেক ভালোবাসেন। তাছাড়া উনি ইসলামিক ব্যাপারে দাদীজির চাইতে ভালো বোঝেন। নাজমা ফুফুর মতে যদি কেউ ভালো মুসলিম হয় তার মানে সে একজন ভালো মানুষ, সৎ ও দায়িত্ববান। পাকিস্তানি কি না তাতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু দাদীজির তো লোকে কী বলবে এটা নিয়ে বেশি মাথা ব্যাথা।”

“বুঝতে পারছি ” সাজিয়া বললো। তার দাদীও এমনই। “কিন্তু ধরো উনারা ওই লোককে মেনে নিলো না? তখন কী হবে?” সাজিয়া প্রশ্ন করলো।

“সত্যি বলতে সাজ!” ফারহানা হতাশ ভাবে বললো, “আমি একদম জানি না।”

“আর ওনাদের ছেলেমেয়ে কেমন হবে? ওরা পুরোপুরি পাকিস্তানি হবে না। আবার ইংরেজও হবে না। সারাজীবন মাঝখানে আটকে থাকতে হবে। আর কী হবে যদি এই বিয়েটা না টেকে? আমার মনে হয় না এভাবে সবার বিরুদ্ধে গিয়ে বিয়ে করার মানে আছে। সবার কথা মেনে নেয়াই ভালো। আর এমনিতেও দিনশেষে পরিবারের লোকেরাই জিতে যায়...।”

“তুমি কি আসলেই এটা বিশ্বাস করো সাজ?” ফারহানা বুঝতে পারছে না তার কি করা উচিৎ।

“তুমিই বলো, তুমি কি তোমার বাবা মা সবাইকে একটা অচেনা লোকের জন্য ছেড়ে দেবে? কারণ এমন তো না উনি ওই লোককে সারাজীবন ধরে চেনেন। লোকটা ওনার বান্ধবীর ভাই। একই অর্গানাইজেশনে কাজ করেন। আর কয়েকবার কথা হয়েছে। শুধু এইটুকুই! তোমার পরিবার জানে তোমার জন্য কোন জিনিসটা ঠিক...।”

“ওনারা মনে করেন যা আমাদের জন্য ঠিক” ফারহানা শুধরে দিলো, “দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে। নাজমা ফুফু বলেছেন ঐ মানুষটার দ্বীন অনেক মজবুত। আর একসাথে কাজ করতে গিয়ে ফুফু ওনাকে ভালোভাবে জানার সুযোগ পেয়েছেন। আর উনি একজন নও মুসলিম। তাই ফুফুর লন্ডনের জীবন কেমন ছিলো সেটা ভালোভাবে বোঝেন।

আমার পরিবার তো ওনাকে এমন কারো সাথে বিয়ে দিতে চান যে হয়তো কোনও দিন ফুফুকে বুঝবেও না। উনি আলাদা একজন মানুষ। জীবন থেকে সবার চাইতে অন্যরকম জিনিস চান। এমন কোন পরিবারে উনি বিয়ে করবেন না যেখানে ওনার মায়ের বাড়ির মত পুরোনো নিয়ম নীতিতে সবকিছু চলে। ফুফু এমন একটা বিয়ে চান, যেখানে মানুষ হিসাবে আরো ভালো হওয়ার সুযোগ থাকবে। আর সবচাইতে বড় কথা, উনি পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন চান। আমাদের মত পাঁচমিশালি সংস্করণ না।"

"অন্তত ফুফু এটাই বলেন...।" ফারহানা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো।

□

যখন ফারহানা রমজানের প্রথম দিনগুলোর কথা ভাবে, তখনকার সাথে সে এখনকার নিজের কোন মিল খুঁজে পায় না।

সে অবিচল ছিলো। তার বিশ্বাস হৃদয়ের চূড়ায় ছিলো। এখন সে আবার আগের সেই প্রশান্তি চায়। যা সে কুরআন, নামাজ, রোজা আর তারাবীহতে পেয়েছিলো।

সব কোথায় চলে গেছে?

সে জানে মালিকের কল পাওয়ার পর থেকে সব শুরু হয়েছে। তখনই সে প্রথম নিজের দূর্বলতা বুঝতে পেরেছে। আর তার সাথে মায়ের সবসময় হিজাব নিয়ে বাজে কথা আর ফারাজের বিপথে যাওয়া তো আছেই। এখনো তাদের দুজনের ঝামেলা মেটেনি। ফারাজ স্ক্রুজের সাথে ঘোরা বন্ধ করেনি। আর তার জন্য ফারহানা তাকে কখনো ক্ষমা করবে না।

সে যতই দোয়া করুক, মালিকের জন্য তার ভালোবাসা একটুও কমেনি। তার এখনো প্রচণ্ড খারাপ লাগে। বিশেষ করে রাতের বেলায়। মালিকের কথা অনেক মনে পড়ে। কথা বলতে ইচ্ছা করে। তার কথা শুনতে ইচ্ছা করে। ফারহানা কয়েকবার ফোন করেছে। কিন্তু রিসিভ করার আগেই আবার কেটে দিয়েছে। আর মালিক যখন ফোন কওে, সে নিজেকে অনেক কষ্টে কথা বলা থেকে আটকে রাখে।

"তুমি এত গবেট কেন ফারহানা?" রবিনা ক্লাসের ফাঁকে তাকে বলেছিলো। "তুমি জানো কতো মেয়ে আছে যারা মালিকের সাথে থাকার জন্য জীবন দিয়ে দেবে? আর তোমার কাছে মালিক ছিলো, কিন্তু তুমি তাকে চলে যেতে দিলে! আর এখন তো আবার হিজাব পরা শুরু করেছো। মালিক আর কোনও দিন তোমার কাছে ফিরে আসবে না!"
"কিন্তু হিজাবের উদ্দেশ্যই তো তাই" সাজিয়া তার চশমা ঠিক করতে করতে বলেছিলো। সে রবিনার ফালতু কথা অনেক সহ্য করে ফেলেছে। যেহেতু ফারহানা পর্দা করা শুরু করেছে, রবিনার মনে হচ্ছে সে স্কুলে সবচাইতে জনপ্রিয় হয়ে যাবে।
"দেখো সাজ!" রবিনা সাজিয়ার দিকে ফিরলো, "তোমার মত মেয়েরা হিজাব পরবে বুঝলাম...। কারণ তুমি তো আর দেখতে সুপার মডেলের মত না তাই না?" রবিনা হাসলো, "কিন্তু ফারহানা? কেন ভাই!"
আশেপাশের কয়েকটা মেয়ের হাসি দেখে সাজিয়ার মুখ গরম হয়ে উঠলো। সে চোখের পানি আটকে রাখার চেষ্টা করছে। মনে হচ্ছে তার গলায় কিছু একটা আটকে আছে।
ফারহানা চরম রেগে গেলো। "রবিনা!" ফারহানা ধমক দিয়ে উঠলো, "এসব কোন ধরনের কথাবার্তা?"
"ওহ, এখন তুমি আবার শুরু হয়ে দিয়ো না। তোমার চামচাকে আমি কয়েকটা সত্যি কথা বলেছি বলে তুমি এখন আমাকে জ্ঞান দেবে! তুমি আমাকে চেনো ফারহানা। আমি মানুষকে তার আসল জায়গা দেখিয়ে দেই। আমরা সবাই জানি তুমি সাজিয়ার সাথে মেশো, কারণ ওর জন্য তোমার মায়া হয়!"
তুমি রোজা আছো, ঝগড়া করো না! কিন্তু সাজিয়ার ব্যথাকাতর মুখ দেখে ফারহানা চুপ করে থাকতে পারলো না।
"যত্তসব ফালতু কথা! এইরকম একটা মিথ্যা কথা বলার সাহস কীভাবে হলো তোমার? আমি সাজিয়াকে ছোটবেলা থেকে চিনি। ও আমার সবচাইতে ভালো বান্ধবী। আর একটা কথা কান খুলে শুনে রাখো" সে রবিনার মুখের কাছে মুখ নিয়ে বললো, "সাজিয়া তোমার চাইতে দশগুন

ভালো বান্ধবী। তুমি তো তোমার বোনের নকল করে জীবন কাটাচ্ছো। মিথ্যাবাদী আর লোক দেখানো!"

"লোক দেখানো হাহ্?" রবিনা ফারহানার কথায় খুব বেশি পাত্তা দিলো না। সে নিজের নখের দিকে তাকিয়ে আছে, "মালিক কিন্তু কাল রাতে আমাকে অন্য কথা বলেছে..।"

পুরো ক্লাস রুমে মুহূর্তের মধ্যে গুঞ্জনের ঝড় উঠে গেলো। ফারহানা রবিনার কাছ থেকে পিছিয়ে গেলো। কথাটা তার জন্য একটা থাপ্পড়ের মত ছিলো।

"কী ?" সে কোনরকমে বললো।

রবিনা চোখ কুঁচকে সামনে এগিয়ে আসলো, "তুমি যা শুনেছো ঠিক তাই।"

"অসভ্য বেয়াদব...।" সাজিয়া এর বেশি বলতে পারলো না। "তুমি ফারহানার সাথে এটা কীভাবে করতে পারলে?"

ফারহানা শুন্যদৃষ্টিতে রবিনার দিকে তাকিয়ে রইলো। সে এখনো পুরোটা বুঝতে পারছে না। মালিক? আর রবিনা? এটা কীভাবে সম্ভব...? কিন্তু একেবারে অসম্ভবও তো না।

রবিনা বিজয়ের হাসি দিলো। "আরে! ভালোবাসায় সব জায়েজ। তাই না?" সে ক্লাসের সবার দিকে তাকিয়ে বললো। "তুমি কি ভেবেছিলে ও সারাজীবন তোমার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে?"

ফারহানা আর কোনভাবেই চোখের পানি আটকে রাখতে পারলো না। দৌড়ে ক্লাস থেকে বের হয়ে গেলো। সে যতক্ষণে বাথরুমে পৌছালো, চোখের পানিতে তার মুখ ভরে গেছে।

সাজিয়া ওর পিছন পিছন দৌড়ে আসলো। কিন্তু ফারহানা হাতজোড় করে তাকে চলে যেতে বললো।

"আমি এক্ষণি বাইরে আসবো সাজ! দয়া করে চলে যাও....।"

অবশেষে ফারহানার কান্না যখন থামলো সে বেসিনের সামনে এসে দাঁড়ালো। সে আয়নায় দেখলো একটা ফ্যাকাসে মুখ আর একজোড়া লাল চোখ তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে দুই হাত দিয়ে মাথা থেকে তার স্কার্ফ

কাঁধ পর্যন্ত নামিয়ে দিল। তার ঘন কালো চুল বাইরে বেরিয়ে এলো। নিজের দিকে তাকিয়ে সে আবার কাঁদতে শুরু করলো।
আমি কি অপরাধ করেছি? কী অপরাধ?

ফারহানা স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে সোজা নিজের রুমে চলে গেলো। তারপর টানা তিন ঘণ্টা পর ঘুম থেকে উঠলো। যখন তার ঘুম ভাঙলো চারিদিক প্রায় অন্ধকার হয়ে গেছে। আর তার মা নিচ থেকে ইফতারের জন্য ডাকছেন। ইফতারের পর নামাজ পড়ে ফারহানার আগের চাইতে ভালো লাগছে। আর আজ ফারাজকে বাড়িতে দেখেও মন ভালো হয়ে গেছে। ইফতারের সময় ফারহানা বারবার ভাইয়ের দিকে তাকিয়েছে। ওর মুখের ভাষা পড়ার চেষ্টা করেছে। কিংবা ওর নিরবতা বোঝার চেষ্টা করেছে।
ইফতার শেষে বাবা ওদের দুজনকে বললেন, "আমি আর তোমার মা একটু আলী চাচার বাসায় যাবো কথা বলতে। তোমরা বাড়িতে থাকো।"
"কী কথা বাবা?" ফারাজ জিজ্ঞাসা করলো।
ওদের বাবা জবাবের জন্য মায়ের দিকে তাকালেন। তিনিও চুপ করে আছেন।
"নাজমা ফুফুর ব্যপারে আলোচনা হবে তাই না?" ফারহানা প্রশ্ন করলো।
"উনি একজন ইংরেজকে বিয়ে করতে চাচ্ছেন তাই?"
"ফারহানা" মা রেগে গেলেন, "বড়দের ব্যপারে কথা বলবে না! এখানে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না। আমরা বড়রা ঠিক করবো কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।"
ফারাজ ফারহানার দিকে তাকালো, "তুমি কী বলছো? ফুফু একজন ইংরেজকে বিয়ে করতে চান?"
ফারহানা মাথা নাড়ালো, "হ্যাঁ, কিন্তু উনি মুসলিম। আর কথা শুনে মনে হয় একজন বেশ ভালো মানুষ। সত্যি বলতে আমার মনে হয়....।"

"ফারহানা!" মা চিৎকার করে উঠলেন, "তুমি এটা কীভাবে বললে? এই ধরণের বিয়ে কখনো টেকে না! নিজের লোকদের বিয়ে করতে সমস্যা কোথায়? নিজের লোকের বাইরে বিয়ে করা মানে গ্যাঞ্জাম তৈরি করা...।"
"নিজের লোক?" ফারহানার কণ্ঠস্বরও উঁচুতে উঠে গেলো, "আপনি কাদের নিজের লোক বলছেন আম্মাজি? আমার জন্ম ইংল্যান্ডে হয়েছে! আমি কোন রকমে উর্দু বলি! এখানকার একজন মানুষের চাইতে পাকিস্তানি কারো সাথে আমার কীভাবে বেশি মিল থাকবে? এটা কীভাবে সম্ভব?"
"ফারহানা!" এবার বাবা কথা বলে উঠলেন, তার কণ্ঠে শাসনের সুর। "তোমার মায়ের সাথে সম্মান দিয়ে কথা বলো...। "
"আমি আম্মাজিকে সম্মান করি। কিন্তু তার মানে এই না যে আমার নিজের কোন মতামত থাকবে না। আপনারা কেন চান যে আমরা একদম আপনাদের মত হবো? আমরা ব্রিটিশ, আম্মাজি। ব্রিটিশ এশিয়ান, ব্রিটিশ মুসলিম, কিছু একটা! আমরা কোনও দিন আপনাদের মত হতে পারবো না। পাকিস্তানি হতে পারবো না। আপনারা কি চান নাজমা ফুফু শুধুমাত্র পাকিস্তানি বলে এমন একজনকে বিয়ে করুন, যে কখনো তাকে বুঝবে না। তার স্বপ্নের দাম দেবে না। কখনো তাকে সুখে রাখতে পারবে না?"
মা কিছু একটা বলার চেষ্টা করলেন কিন্তু ফারহানা থামলো না। "আমি তো ভেবে ছিলাম ইসলাম সর্বব্যাপী। আল্লাহ্ আমাদের বংশপরিচয় দেখেন নাকি আমাদের হৃদয়? মেনে নিন যে এশিয়ানরা তাদের ছেলেমেয়ে বাইরে বিয়ে দিতে চায় না। কারণ তারা নিজেরাই বর্ণবাদী!"
ফারহানার বাবা মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "তুমি আমাদের বর্ণবাদী বলছো ফারহানা? তুমি কি ভুলে গেছো এই ইংরেজ গুন্ডারা এসে আমাদের দোকান তছনছ করে দিয়ে গেছে? প্রতিদিন আমরা বৈষম্যের স্বীকার হচ্ছি?"
ফারহানা বাবার দিকে চেয়ে কষ্টের হাসি দিয়ে বললো, "কিন্তু তাই বলে আমরা তো মানুষের গায়ের রং দেখে তাদের বিচার করা বন্ধ করিনি তাই না? মনে আছে স্কুলে আমি যে মেয়েটার সাথে খেলতাম এডিথ? আপনারা কোনও দিন তাকে বাড়িতে নিয়ে আসতে দেননি, কারণ সে নিগ্রো। আর

আজ আপনারা নাজমা ফুফুর বিরুদ্ধে যাচ্ছেন, কারণ লোকটা সাদা। আমি জানি না আপনারা এই ধরনের ব্যবহারকে কী বলেন আম্মাজি! কিন্তু আমার কাছে এটাই বর্ণবাদ।"

"আমি ফারহানার সাথে একমত মা!" ফারাজ বললো।

তার মা অবাক হয়ে ছেলের দিকে তাকালেন, "ফারাজ!"

"হ্যাঁ মা, আমি ঠিক বলছি। কাউকে এভাবে বিচার করা ঠিক না। একেবারেই ঠিক না। " সে মাথা নিচু করে বোনের দিকে তাকানোর চেষ্টা করলো। ফারহানা কৃতজ্ঞ চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

বাবা মা তাদের সন্তাদের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রইলেন, যেন তারা অচেনা কাউকে দেখছেন। ওরা আগের মতই দেখতে আছে। কিন্তু তবুও কতো পাল্টে গেছে।

আম্মাজি এই প্রথম ফারহানার না ঘুমানো চোখের নিচের কালো দাগ আর ছেলের ফ্যাকাসে মুখ লক্ষ করলেন। তার বাচ্চাদের কী হয়েছে? তার ইচ্ছা করলো ছোটবেলার মত দুজনকে একসাথে কোলে তুলে নেন। তখন সবকিছু সহজ ছিলো। কোন পাকিস্তানি ব্রিটিশ নিয়ে তর্ক ছিলো না। শুধু মায়ের ভালোবাসা ছিলো। শেষবার উনি ছেলেমেয়েকে কবে জড়িয়ে ধরেছেন?

কিন্তু তিনি সন্তানদের দিকে তাকিয়ে যেন দেখতে পেলেন তাদের মাঝখানে বিশাল এক ফটাল। না বলা সব কথা, গোপনীয়তা, নিজেদের রক্ষা করার তাগিদ। তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। উজমা জমজদের বাবার দিকে ফিরলেন।

"আমাদের বেরুতে হবে জান। না হলে দেরি হয়ে যাবে।" তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং সন্তানদের দিকে আর একবার তাকিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

বাবা ফারহানার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ালেন, "মা! আমি জানি না কি বলবো...। " তিনি ধীরে বললেন।

"বলুন আপনি ওই লোকটাকে একটা সুযোগ দেবেন বাবা" ফারহানা শান্ত স্বরে বললো, "আমার মনে হয় তাকে অন্তত একটা সুযোগ দেওয়া উচিৎ।"

সপ্তদশ অধ্যায়
প্রতিরোধ

ক্লাস শেষের ঘণ্টা পড়ে গেছে। ফারাজ চিন্তিত মুখে আর্ট ক্লাস থেকে বের হয়ে গেলো। সে মাত্র একটা আরবি ক্যালিওগ্রাফি শেষ করেছে গ্রাফিতি স্টাইলে। আর সেটা এর মধ্যেই দেওয়ালে টানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সবাই অনেক প্রশংসা করছে। মি. ম্যাকারথি ফারাজের অনেক প্রশংসা করে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি এই ছবির আইডিয়া কোথা থেকে পেয়েছো ফারাজ?"

ফারাজ তাকে আহমেদ আলীর কথা বললো। একসময় লুকিয়ে ছবি আঁকা একজন মানুষ এখন পুরো বিশ্বে পরিচিত একজন মুসলিম শিল্পী।

"এটা তো খুবই চমৎকার একটা ঘটনা ফারাজ!"

"জ্বি স্যার। আপনি টাউন সেন্টারে গেলেই ওনার কিছুদিন আগে আঁকা গ্রাফিতি দেখতে পাবেন। উনি আমাকে রমজানের শেষের দিকে ওনার সাথে কাজ করার অনুমতি দিয়েছেন।"

"ওহ্ তাহলে তো আর মাত্র কয়েক সপ্তাহ সময় আছে। তাই না?"

ফারাজ মাথা নাড়ালো। রমজান প্রায় শেষের দিকে। তার রমজান কোথায় চলে গেলো? এখন শেষ দশদিন চলছে। মুসলিমদের মতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দশদিন।

সে আগের রাতে দেখা স্বপ্নের কথা ভাবলো। কিভাবে সে পিচ্ছিল, খাঁড়া রাস্তায় উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছিলো। আর তারপর অন্ধকার তাকে গ্রাস করে নিলো। এইবার স্বপ্নটা চলতেই থাকলো।

যখন সবকিছু অন্ধকার হয়ে গেলো ফারাজ আর নিশ্বাস নিতে পারছিলো না! সে প্রথমে অনেক চেষ্টা করলো। কিন্তু কোন লাভ হলো না। তারপর তাকে যেন সাদা কাফনে মুড়ে ফেলা হলো। আর হঠাৎ করে চারিদিক আতরের গন্ধে ভরে গেলো। দূরে কেউ বিলাপ করছে। তার প্রাণ যেন ধীরে ধীরে দেহ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আর চোখ বন্ধ করার আগে সে একজনের মুখ দেখলো। ফারহানার মুখ...। কিন্তু ক্রমেই সব ঝাপসা হয়ে

যাচ্ছে...। না! তাকে থাকতে হবে। তাকে থাকতেই হবে! কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গেছে।

সব আলো নিভে গেলো। আর পড়ে রইলো নিস্তব্ধতা, শুধুই নিস্তব্ধতা।

যখন ফারাজের ঘুম ভাঙলো তখন তার এক হাত বুকের উপর। বালিস ঘামে ভিজে গেছে। ও কিছুক্ষণ বিছানায় বসে হাঁপাতে লাগলো। সে বেঁচে থাকতে চায়। নির্মল বাতাসে ভরে যাক ফুসফুস। প্রত্যেক শিরায় শিরায় রক্ত প্রবাহিত হোক। নিজেকে আবার জীবন্ত মনে হোক।

তারপর সে বাইরে তাকিয়ে দেখলো, এখনো সকালের শুরু হয়নি। সে যদি চায় হয়তো এখনো সম্ভব।

ফারাজ গায়ের চাদর সরিয়ে লাফিয়ে বিছানা থেকে নামলো। বাথরুমে গেলো অজু করার জন্য। ঠাণ্ডা পানির স্পর্শে তার মন শান্ত হয়ে গেলো।

সব ধুয়ে যাক। একেবারে সব ধুয়ে যাক...। যেহেতু এখনো আমার দেহে প্রাণ আছে হয়তো এখনো সময় আছে। এখনো খুব বেশি দেরি হয়ে যায়নি। তারপর সে মায়ের গুছিয়ে রাখা জায়নামাজ বের করে নিয়ে আসলো। মক্কার দিকে মুখ করে জায়নামাজ বিছিয়ে দুই হাত উপরে তুললো। যে শব্দগুলো সে ছোটবেলা থেকে শিখেছে, সেগুলো একে একে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো। এই সবকিছু তার যে অনেক পরিচিত। সে রমজানের প্রথমে যে প্রশান্তি খুঁজে পেয়েছিলো, তা আবার ফিরে এলো। সে মোনাজাতে শুধু একটা জিনিস চেয়েছে। আমাকে পথ দেখাও আল্লাহ্। আমাকে পথ দেখাও। সে এখনো তার স্বপ্নের অর্থ বোঝার চেষ্টা করছে।

কিন্তু স্কুল থেকে বের হয়ে স্ক্রুজের গাড়ি দেখে ফারাজের বুক কেঁপে উঠলো। সাধারণ গাড়ির মধ্যে আরো অনেকে থাকে। কিন্তু আজ স্ক্রুজ একা। "আজকে শুধু তুমি আর আমি ফ্রাজ!" স্ক্রুজ গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে বললো। ফারাজ কিছু না বলে গাড়িতে উঠে গেলো। চুপচাপ স্ক্রুজের কথা শোনা তার অভ্যাস হয়ে গেছে।

ফ্ল্যাটটা প্রায় অন্ধকার আর সব পর্দা নামানো। যখন ফারাজের চোখ অন্ধকার সয়ে গেলো, সে দরজার কাছে একটা কালো ব্যাগ দেখতে পেলো। ময়লা উপচে পড়ছে। ব্যাগের উপর মাছি উড়ছে আর ঘরের বাতাসে এসে মিশছে উটকো গন্ধ।

"এখানে দাঁড়াও" স্ক্রুজ ফারাজকে দরজার সামনে দাঁড় করিয়ে ভিতরে ঢুকে গেলো।

ফারাজ বেশ কিছুক্ষণ বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইলো। সে ভিতরে কী হচ্ছে শোনার চেষ্টা করলো। কিন্তু বাইরের বৃষ্টির শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না। সে এগিয়ে গিয়ে দরজায় হাত রাখতেই সেটা খুলে গেলো। ফারাজের দুর্গন্ধে প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার মত অবস্থা হয়ে গেলো। ঘাম, তারকারি, প্রস্রাব আর মিষ্টি কিছুর একটা গন্ধ মিলেমিশে তীব্র এক ঝাঁঝালো গন্ধ তৈরি হয়েছে। ফারাজের চোখে পানি চলে আসলো। পুরো কার্পেট জুড়ে বাদামি দাগ আর দেয়ালের বিভিন্ন জায়গা সবুজ হয়ে খসে খসে পড়ছে। সারা ঘরে খবরের কাগজ, খাবারের প্যাকেট, জামা-কাপড়, ড্রিংক্স ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা। সে তার জীবনে এমন জঘন্য অবস্থা দেখেনি। কিন্তু রুমের মাঝখানে সবুজ সোফার এক কোণে একটা পরিষ্কার জায়গা দেখা যাচ্ছে। সেখানে একটা প্লেট রাখা। আর প্লেটের উপর খুব সুন্দরভাবে কয়েকটা সিরিঞ্জ, একটা স্টিলের চামচ আর লাইটার সাজিয়ে রাখা। ফারাজ রুম থেকে বের হয়ে আসলো। তার মাথা ঘুরছে। স্ক্রুজের ভাই নেশাখোর? ফারাজ বুঝতে পারছে না তার কি করা উচিৎ। যদিও স্ক্রুজ তাকে এখানেই থাকতে বলেছে। কিন্তু সে ফারাজের ভাইয়ের সম্পর্কে আরো কিছু জানার কৌতুহল থামাতে পারছে না। ফারাজ হাত দিয়ে নাক চাপা দিয়ে ধীরে ধীরে ভিতরে ঢুকলো। তারপর স্ক্রুজ যে রুমে ঢুকেছিলো সেটার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ফাঁকা জায়গা দিয়ে ভিতরে উঁকি দিলো। স্ক্রুজের ভাই এলোমেলো বিছানায় হাত, পা ছড়িয়ে পড়ে আছে। চোখ অর্ধেক খোলা। সারামুখ চুল আর দাঁড়িতে

ঢাকা। আর হাতে অসংখ্য ছিদ্র। স্ক্রুজ অনেক মমতা দিয়ে ভাইকে ডেকে তোলার চেষ্টা করছে।
আনোয়ার তার রক্ত জমে যাওয়া চোখ খুললো। মনে হলো ভাইকে চিনতে তাকে বেশ কষ্ট করতে হচ্ছে।
"তুমি কি আমার জিনিস নিয়ে এসেছো খালিদ?" তার কণ্ঠস্বর শুনে মনে হচ্ছে কেউ গলা থেকে চিপে কথা বের করছে। "কি হলো জিনিস এনেছো?"
স্ক্রুজ মাথা নাড়ালো। ভাইকে সোজা করে তার সোয়েটার আর জুতা পরিয়ে দিলো।
বাদামি রঙের পাউডার ভরা প্যাকেট দেখে আনোয়ার দাঁত বের করে হাসতে লাগলো। যদিও বেশিরভাগ দাঁতের জায়গা ফাঁকা হয়ে গেছে।
"আলহামদুলিল্লাহ্" আনোয়ার আনন্দের নিশ্বাস ফেললো। তারপর বিছানার নিচ থেকে সোফায় রাখা থালার মত একটা থালা বের করে নেশার জিনিস বানাতে লাগলো। হঠাৎ করে যেন সে অন্য মানুষ হয়ে গেছে। একের পর এক পরিবার আর বন্ধুদের নিয়ে প্রশ্ন করে যাচ্ছে।
"মা কেমন আছে খালিদ? এখনো কি হাঁটুতে ব্যথা হয়? রমজান কেমন কাটছে? মায়ের বিরিয়ানির কথা আমার এখনো মনে পড়ে... ।"
স্ক্রুজ তথা খালিদ ধৈর্য্য ধরে তার ভাইয়ের সব প্রশ্নের জবাব দিলো। সে নিচে পড়ে থাকা নোংরা কাপড় গুছিয়ে রাখছে।
"রমজান ভালোভাবেই চলছে। ঈদে লন্ডন থেকে আব্বাস মামা আসছেন। তোমার মা অনেক খুশি।"
তারা কথা চালিয়ে যেতে লাগলো। স্ক্রুজ রাস্তার গুন্ডা থেকে পুরোপুরি পাকিস্তানি ভাই হয়ে গেছে। ফারাজ আর সহ্য করতে পারছে না। সে দরজা থেকে পিছিয়ে গেলো। তার যেখানে দাঁড়িয়ে থাকার কথা সেখানে পৌছাতে সে কয়েকবার হোঁচট খেলো।
ফারাজ ভাবলো, এসব পাগলামি। পুরো পাগলামি।
খালিদ নামের গুন্ডারা রাস্তা থেকে ইংরেজ মেয়ে তুলে নিয়ে ফুর্তি করে বেড়ায়। কিন্তু বিয়ে করতে চায় ভদ্র পাকিস্তানি মেয়েদের। দাঁড়িওয়ালা

পাঞ্জাবি পরা নেশাখোর ড্রাগস হাতে নিয়ে বলে আলহামদুলিল্লাহ্। পবিত্র রমজান মাসে চারিদিকে যখন মানুষ রোজা রাখছে, নামাজ পড়ছে, দিনরাত ইবাদাত করছে, সেখানে একদল একই সময়ে নেশা করছে। ডাকাতি করছে আরো কতো কি। ফারাজের মনে হলো সে গোলক ধাঁধায় পড়ে গেছে।

ফারাজের রমজানের প্রথমে শোনা সেই সব কথা মনে পড়ে গেলো। যখন তার জীবনে সবচেয়ে সুন্দর সময় এসেছে। আবার খারাপ সময় এসেছে। তখনই ময়লার ব্যাগ থেকে আসা দুর্গন্ধে তার আবার পেট মোড়াতে লাগলো।

"স্ক্রুজ!" সে হঠাৎ ডেকে উঠলো, "আমি এই ময়লাগুলো বাইরে ফেলে আসছি। ঠিক আছে?"

ভেতর থেকে কিছু একটা জবাব আসলো। ফারাজ সেটাকে অনুমতি ধরে নিয়ে ময়লার ব্যাগ নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলো।

এভাবে চলতে পারে না। সে ভাবলো, আমি এভাবে আর চলতে দিতে পারি না।

ফারাজ ময়লার ব্যাগ ডাস্টবিনে ফেলে নিচে পৌছানোর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। এটা নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। আরো নিচে, আরো নিচে। যখন ব্যাগ নিচে গিয়ে ঠেকলো সে কাঁচের বোতল ভাঙার শব্দ পেলো।

এটা আমি ফারাজ ভাবলো। আমি ধীরে ধীরে পাতাললোকের দিকে নেমে যাচ্ছি। ময়লার ব্যাগের মত একদিন আমিও এভাবে ভেঙে চুরমার হয়ে যাবো।

স্ক্রুজ নিচে নেমে দেখলো ফারাজ গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখ সাদা হয়ে গেছে। আর সারা গা ঘামে ভিজে গেছে।

"তোমার কি হয়েছে?" স্ক্রুজ জিজ্ঞাসা করলো। তার মুখ থেকে নেশাখোর ভাইয়ের খেয়াল রাখা খালিদের সব চিহ্ন মুছে গেছে।

"কিছু না, কিচ্ছু না।"

স্ক্রুজ আর কোন কথা না বলে নিজের চাচাতো ভাইয়ের ময়লা জামাকাপড় গাড়িতে তুলতে লাগলো। তারা বেশ কিছুক্ষণ গাড়ি চালিয়ে সিগনালে এসে আটকালো। ফারাজ জানালা দিয়ে বাইরের বৃষ্টি দেখতে লাগলো। তাদের পাশে একটা লাল রঙের মিনি কুপার দাঁড়ানো। গাড়ির চালক নেকাব পরে আছেন। তাদের দুজনের চোখাচোখি হলো। ফারাজ বুঝতে পারলো উনি ফারাজকে চিনতে পেরেছেন। আর তারপর নাজমা ফুফু ফারাজের পাশে ড্রাইভারের দিকে তাকালেন।

ফারাজ তার ফুফুর মুখের ভাব বুঝতে পারছে না। আর তখনি সিগনাল সবুজ হয়ে গেলো। নাজমা ফুফুও তাদের পিছনে গাড়ি চালিয়ে দিলেন। স্ক্রুজ ফারাজকে রাস্তার শেষ মাথায় নামিয়ে দিলো।

"কাল তোমার সাথে দেখা হবে। ঠিক আছে?" সে ফারাজকে ডেকে বললো, " স্কুলে যাওয়ার আগে আমার একটা জিনিস পৌছে দিতে হবে। পারবে?"

ফারাজ কিছুই বললো না। সে শুধু মাথা নাড়িয়ে নিজের বাড়ির দিকে হাঁটা শুরু করলো। গেটের কাছে পৌছে সে মিনি কুপার দাঁড় করানো দেখতে পেলো।

নাজমা ফুফু গাড়ির জানালা দিয়ে মাথা বের করে দিলেন।

"আসসালামু আলাইকুম ফারাজ!" তিনি ডাকলেন, "তোমার সাথে আমার কথা আছে।"

জীবনে এই প্রথম ফারাজের নাজমা ফুফুর সাথে কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। সে বাড়ির দরজার দিকে তাকিয়ে রইলো।

"উমম ফুফু পরে কথা বলি? আসলে আম্মাজি অপেক্ষা করে আছেন।"

"না ফারাজ! পরে না। এক্ষণি" নাজমা কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন। "গাড়িতে উঠে এসো।"

ফারাজ গাড়ির পেছনের দরজা খুলে মাথা নিচু করে ভিতরে ঢুকলো। সে বৃষ্টিতে ভিজে গেছে।

"আমরা একটু দূরে কোথাও যাবো" ফুফু গাড়ির সামনের আয়নায় ফারাজের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন।

নাজমা বেশ খানিকক্ষণ চুপচাপ গাড়ি চালিয়ে গেলেন। অবশেষে তিনি মুখ খুললেন। "ফারাজ!" উনি বললেন, "তুমি স্ক্রুজের মত একজনের সাথে কেন ঘুরছো?"
"স্ক্রুজ?" ফারাজ যেন অবাক হয়ে গেলো। সে ঘামতে শুরু করেছে। "ওহ্, তেমন কিছু না। শুধু একটু ঘুরতে গিয়েছিলাম এই যা। আমি তো ওকে ভালোভাবে চিনিই না...।"
নাজমা ফুফু হঠাৎ জোরে ব্রেক কষে গাড়ি থামিয়ে দিলেন।
"আমার সামনে মিথ্যা বলবে না ফারাজ!" ফারাজ কখনো তার ফুফুকে এত জোরে কথা বলতে শোনেনি। সে দেখলো নাজমার চোখে পানি আর স্টিয়ারিং হুইলে রাখা তার হাত দুটো কাঁপছে।
"খবরদার আমাকে মিথ্যা বলবে না!" তিনি আবার বললেন, তার গলা কাঁপছে। "একদম না!"
ফারাজ বুঝতে পারছে না তার কী বলা উচিত। বেশ কয়েকবার সে কথা বলার জন্য মুখ খুললো। কিন্তু কোন স্বর বাইরে এলো না। সে কোথা থেকে শুরু করবে? কতটুকুই বা বলবে? আর তারপর ফারাজের মনে হলো এই বিকালের বৃষ্টির মত তার সারা শরীর লজ্জা দিয়ে ভিজিয়ে যাচ্ছে। রমজানের প্রথমে ফুফুর সাথে কথা বলার অনুভূতির সাথে এই অনুভূতির আকাশ পাতাল তফাৎ।
ফারাজ কান্না লুকানোর জন্য অন্যদিকে তাকালো। সে কোনমতেই বলতে পারবে না।
তারপর নাজমা ফুফু তার আগের গভীর কোমল গলায় বললেন, "আমি জানি ফারাজ! আমি জানি।"
ফারাজ ফ্যাকাসে মুখে তার ফুফুর দিকে তাকালো।
"আমি জানি স্ক্রুজ তোমাকে দিয়ে কী করাবে। আমি জানি ও তোমার কাছে কী চায়। আমি ওকে চিনি ফারাজ! তোমার চাইতেও ভালোভাবে চিনি।"
"আপনি ওকে চেনেন?" ফারাজের কথা আটকে গেলো, "কীভাবে?"
নাজমা ফুফু তার নেকাব খুলে ফেললেন। ফারাজ জানে বাইরের বৃষ্টির জন্য তাদের কেউ দেখতে পাবে না।

"ফারাজ আমি এক সময় তোমার মত একটা ছেলেকে চিনতাম। সুন্দর, লাজুক ও আবেগি। সে আমাদের পাশের বাড়িতে থাকতো। আমাদের পরিবারের মধ্যে ভালো সম্পর্ক ছিলো। অন্যদের চাইতে আলাদা ছিলো বলে তাকে নানা রকম যন্ত্রণা সহ্য করতে হতো। কিন্তু আমি তাতে পাত্তা দেইনি। সে আমার বন্ধু ছিলো। আর আমি তাকে ভালোবাসতাম।

"তারপর আমরা ওই এলাকা থেকে চলে আসি। আর অনেকদিন আমি তার কোন খোঁজ পাইনি। আমরা বড় হয়ে গিয়ে ছিলাম। ভিন্ন স্কুলে পড়েছি। জীবন অন্যদিকে চলে গেছে। আর যোগাযোগও বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু আমি তাকে কখনো ভুলতে পারিনি। মাঝে মাঝেই আমি কল্পনা করতাম, সে আমাকে খুঁজে বের করেছে। আমরা বিয়ে করেছি। আর তারপর একসাথে সুখে শান্তিতে সারা জীবন কাটিয়ে দিয়েছি। আমার নিজের রুপকথা সত্যি হয়ে যাওয়ার মত।"

তিনি হাসলেন। আর তারপর চোখ মুছে আবার শুরু করলেন, "ফারাজ! তুমি হয়তো বা তোমার মা-ফুফুদের কাছে শুনেছো যে অল্প বয়সে আমি পুরো বেয়াড়া হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমার পরিবার আমার কাজকর্মের অর্ধেকও জানেন না। আমি স্কুলে একদল মেয়ের সাথে ঘুরতাম। আর একসাথে আমরা সব রকমের বাজে কাজ করে বেড়িয়েছি।"

ফারাজ তার ফুফুর দিকে তাকিয়ে রইলো। তিনি বলে গেলেন।

"আমি জানি ফারাজ; আমরা সবাই অন্যদের সাথে মিশতে চাই। তাদের মত হতে চাই। অন্যদের মত জীবন যাপন করতে ইচ্ছা করে। আমাদের বাবা-মা আমাদের যে জীবন থেকে বঞ্চিত করতে চান, আমরা সেই জীবনের স্বাদ নিতে চাই। আমার বাবা-মা আমাকে শুধু স্কুলে যেতে আর আসতে দেখেছেন। আমার সালোয়ার-কামিয আর দোপাট্টা দেখেছেন। আমি স্কুলে কী করি এটা নিয়ে ওনারা কখনোই মাথা ঘামাননি। আমার জন্যও তাই ক্লাস না করে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ানো সহজ ছিলো। আমাদের জন্য তখন ওটাই জীবন ছিলো।

"ওই সময়েই আমার এক বন্ধুর মাধ্যমে খালিদের সাথে (ব্রুজের আসল নাম) পরিচয় হয়। তখনো খালিদ অনেক জনপ্রিয় ছিলো। চারিদিকে

অনেক নাম ডাক ছিলো। আর ওর মত একজন মানুষ আমাকে পছন্দ করতো। এতে আমার ভালোই লাগতো...।"

ফারাজ তার ফুফুকে থামিয়ে দিলো। সে আরো শুনতে ভয় পাচ্ছে, "ফুফু আপনি!"

"আমাকে শেষ করতে দাও ফারাজ। আমি অস্বীকার করবো না টাকা আর গাড়ি দেখে আমি সব ভুলে গিয়ে ছিলোাম। আমি কিছুদিন ওকে ঘুরিয়েছি। আমার ভালো লাগছিলো। স্কুলের সময়ে খালিদ আমাকে গাড়িতে নিয়ে ঘুরতে যেতো। তার টাকার গল্প শোনাতো। জীবনে সে কতো বড় জায়গায় যাবে সেই গল্প। একদিন আমি দোকান থেকে ড্রিংকস কিনছিলাম। আর খালিদ গাড়িতে বসে ছিলো। আমি ফিরে এসে দেখলাম, আমার বয়সের একটা ছেলে খালিদের সাথে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলো। খুবই সুন্দর একজন মানুষ। কিন্তু দেখে মনে হচ্ছিলো অনেকদিন জামা কাপড় বদলায়নি। তার চুলগুলো সব এলোমেলো ছিল। একটা কটু গন্ধ পেয়ে আমি পিছিয়ে গেলাম। আর তখনই ছেলেটা আমার দিকে ফিরে তাকালো। আমি প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলাম...।"

"কেন ফুফু?"

নাজমা ফুফু চোখ বন্ধ করলেন। তিনি যেন চোখের সামনে সেই দুঃস্বপ্ন আবার দেখছেন। সেই পরিচিত মুখ। অনেক পরিচিত, আবার একদম অপরিচিত। ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া খসখসে চামড়া, রক্তবর্ণ চোখ ও ভয়ংকর দৃষ্টি। সেই চোখ... সেই চোখ....।

"আনোয়ার!" ফুফু ফিসফিস করে বললেন।

মুহূর্তের মধ্যে ফারাজের মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেলো।

নাজমা ফারাজকে এর পরের ঘটনা বললেন। কীভাবে তিনি নাম ধরে ডাকার পর আনোয়ার লজ্জায়, ভয়ে কুঁকড়ে গিয়ে সোয়েটারে নিজের রুগ্ন মুখ ঢেকেছিলো।

"আমার ছোট বেলার বন্ধু। আমার স্বপ্নের রাজপুত্র আনোয়ার। একটা শূন্য, ভাঙা খোলসে পরিণত হয়েছে। 'আনোয়ার! তোমার কি হয়েছে? তোমার

এই অবস্থা কে করেছে? বলো আমাকে!' আমি ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম।
"

সেদিন আনোয়ার নাজমার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকিয়েছিলো। সে কিছু একটা বলার জন্য মুখ খুলছিলো। কিন্তু স্ক্রুজ তাকে থামিয়ে দিয়েছিলো।

নাজমা আবার বলতে লাগলো, "সে ধমক দিয়ে ওকে বলেছিলো, 'বাড়ি যাও আনোয়ার! তোমার অবস্থা খারাপ...'

'তুমি?' আমি চিৎকার করে উঠেছিলাম 'তুমি ওর এই অবস্থা করেছো?'

খালিদ,স্ক্রুজ অবজ্ঞা ভরে বলেছিলো, 'আমি কি জানতাম নাকি যে এই গাধা নিজেই ড্রাগস নেওয়া শুরু করবে। সুন্দর চেহারা ওয়ালা গবেট ছেলেগুলোর এই অবস্থা হয়...।"

"ওই মুহূর্তে ওকে যে আমার কি করতে ইচ্ছে করছিলো। আমি শুধু আমার বন্ধু আনোয়ারের কথা ভাবছিলাম। আনোয়ার, যে আমার জন্য সুন্দর সুন্দর গল্প বানাতো। বালির ঘর বানাতো। আমাকে সাইকেল চালানো শিখিয়েছিলো। আমার কতো দোষ নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। আমি ওর মায়ের কথা ভাবলাম। আনোয়ার ওর মায়ের সবচেয়ে প্রিয় সন্তান ছিলো। ওর বাবা ওকে নিয়ে গর্ব করতো। স্কুলে সব খেলায় প্রথম হওয়া ছেলে আনোয়ার।"

"আমার হৃদয় ভেঙেচুরে চুরমার হয়ে যাচ্ছিলো। এটা মেনে নেওয়া যায় না! তখন আমি বুঝলাম স্ক্রুজ তার ক্ষমতা পেয়েছে অন্য মানুষের জীবনের পুরোটা নিঃশেষ করে দিয়ে। তারপর আমি চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে স্ক্রুজকে গালাগালি দিয়ে মারতে লাগলাম। ও আমাকে থামানোর চেষ্টা করলো। ভয় দেখানোর চেষ্টা করলো। কিন্তু আমি রাগে পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। আশেপাশের সব লোকজন আমার দিকে তাকিয়ে ছিলো। কিন্তু ওসব নিয়ে আমি তখন ভাবিনি। খালিদ কোনরকমে আমার হাত ধরে গাড়িতে বসায়। তখনো আমি ওকে গালি দিচ্ছিলাম। তখন আমি গাড়ির দরজা খুলে আনোয়ারের নাম ধরে ডাকতে লাগলাম। আমি ওর কাছে

যেতে চেয়েছিলাম। ওকে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম। ওকে ওর বাবা মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলাম।

"কিন্তু খালিদ আমাকে ধরে থামিয়ে দিলো। আমার হাত ধরে ঝাঁকি দিয়ে বললো, 'ও শেষ হয়ে গেছে নাজমা! এটাই জীবন। এখন আমি কিছু করার আগে চুপ করো। আর শান্ত হও!' ও আমার চুল মুঠির মধ্যে চেপে ধরে গাড়ি চালিয়ে দিলো। আর আমি আনোয়ারের নাম ধরে ডাকা বন্ধ করার আগ পর্যন্ত ধরে রইলো।

"ঐ শেষবার আমি আনোয়ারকে দেখি। আমি জানি না ও এখন কোথায় আছে। কিন্তু ঐদিনটা আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। ব্যপারটা এমন ছিলো যে আমি একটা অন্ধকার জগতে ছিলাম। আর হঠাৎ করেই আর অন্ধকার সহ্য করতে পারিনি। আমি বেরিয়ে আসতে চেয়েছি। আর তখনই আমি ভালোভাবে পড়াশোনা করে দূরের ইউনিভার্সিটিগুলোতে পরীক্ষা দেওয়া শুরু করি। আমি ঐ জায়গা থেকে পালাতে চেয়েছি। দূরে কোথাও। অন্যকিছুর সন্ধানে। আর আমি যা খুঁজছিলাম তা একদিন পেয়েছি।"

নাজমা ফুফু বড় করে নিশ্বাস নিয়ে হতবাক হয়ে থাকা ফারাজের দিকে তাকালেন।

"আমি তোমাকে আনোয়ারের মত হতে দেবো না ফারাজ। আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে ভয় পাবে না ফারাজ। তোমাকে শক্ত হতে হবে। মানুষ একটাই জীবন পায়। আর তুমি সেটাকে নষ্ট করছো। ক্লুজের সাথে সব সম্পর্ক শেষ করবে। আজকেই...।"

ফারাজ বাড়ি ফিরে দেখলো তার বাবা আর মা মসজিদে গেছেন ইফতার বিলি করতে। সে সোজা ফারহানার রুমে চলে গেলো। দরজায় টোকা দেওয়ার আগে সে কয়েকবার ভাবলো। ফারহানা দরজা খুলে ফারাজকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলো, "তুমি কী চাও?"

"আসসালামু আলাইকুম বোন। আমি কি ভিতরে আসতে পারি? তোমাকে আমার কিছু বলার আছে।"
ফারহানা আস্তে করে সরে গিয়ে ভাইকে ভিতরে আসতে দিলো।
দরজা বন্ধ করার সাথে সাথে ফারাজ কেঁদে ফেললো। সে ফারহানাকে বললো, "আমি দুঃখিত। সব কিছুর জন্য দুঃখিত!" গত কয়েক সপ্তাহে সে যা করেছে সেগুলো ভেবে ফারাজের চোখ দিয়ে অনবরত পানি পড়তে লাগলো।
ফারহানাও কেঁদে ফেললো, "আমিও ফারাজ। আমিও দুঃখিত। অনেক বেশি।"
জমজরা একে অপরকে জড়িয়ে ধরলো। নিজেদের থেকে আলাদা হয়ে তারা দুজনেই কষ্ট পেয়েছে।
"আমাদের দুজনের অবস্থা দেখো" ফারহানা কান্নার মাঝেই হেসে বললো। "একবার ভাবো তোমার বন্ধুরা যদি এখন তোমাকে দেখতো!"
এই কথায় ফারাজের মুখ কঠিন হয়ে গেলো। "নাহ স্ক্রুজ আর ওর লোকেদের সাথে আমার আর কোন সম্পর্ক নেই। সব শেষ।"
তারপর সে ফারহানাকে সব বললো। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে সে কী করেছে। নাজমা ফুফু তাকে যা যা বলেছেন সব। ওর কথা শুনে ফারহানা ফ্যাকাসে হয়ে গেলো। তখনই তারা গেটের বাইরে তাদের পরিচিত গাড়ির শব্দ পেলো। কোন কথা না বলে জমজরা একে অন্যের দিকে তাকালো।
তারপর ফারাজ সোজা হয়ে বললো, "আমাকে যা করার এক্ষণি করতে হবে।"
ফারহানা সায় দিলো। সেও ফারাজের পিছন পিছন নেমে এলো।
রাস্তার আলোগুলো বৃষ্টির পানিতে ঝাপসা হয়ে গেছে। ফারহানা গাড়িতে বসা লোকগুলোকে চিনতে পারলো না। সে দেখলো ফারাজ ড্রাইভারের সাথে কথা বলছে। ফারাজ বারবার মাথা নাড়াচ্ছে। হাত নাড়িয়ে জোর দিয়ে কিছু একটা বলছে। তারপর এক সময় বিশাল কালো বিএমডব্লিউটা ইঞ্জিনে ঝড় তুলে চলে গেলো।

ফারাহানা তার বৃষ্টিভেজা ভাইয়ের মুখের ভাষা পড়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু ফারাজ একবারও তার মুখের দিকে তাকায়নি।

"ফারাজ?" ফারহানা কোমল স্বরে বললো।

ফারাজ বোনের কাঁধে হাত রাখলো। "সব ঠিক হয়ে যাবে বোন ইনশাআল্লাহ্" সে দৃঢ় গলায় বললো, "সব ঠিক হয়ে যাবে।"

কিন্তু তার বুক এখনো কাঁপছে। সে ক্লুজের সাপের মত গলা শুনতে পাচ্ছে। "তোমাকে এর মূল্য দিতে হবে বন্ধু। তুমি শুধু অপেক্ষা করো।"

পরের দিন স্কুলে যাওয়ার সময় ফারাজ ক্লুজের দেওয়া নতুন মোবাইল রাস্তার পাশের ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে গেলো।

অষ্টাদশ অধ্যায়

ধাক্কা

আজ ফারহানার দেরি হয়ে গেছে। ফারাজকে অনেক কষ্ট করে তাকে সাহ্‌রীতে তুলতে হয়েছিলো। ফারহানা কোনমতে আধোঘুমে খাওয়া শেষ করে আবার ঘুমাতে চলে গেছে। আর ঘুম থেকে উঠে দেখলো ব্যাথায় মাথা ছিঁড়ে পড়ে যাচ্ছে। হাত পা সব ভারি হয়ে যাছে। সে জামা কাপড় পরতে গিয়েই বুঝলো আজ স্কুলে দেরি হয়ে যাবে।

সে চুল আঁচড়ে পিছনে শক্ত করে বাঁধলো।

গতরাতে ভাইয়ের সাথে কথা বলে তার মন অনেক ভালো হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু আজকে সাদা স্কার্ফটার দিকে তাকিয়ে সে আগের আনন্দ খুঁজে পেলো না। ফারহানা ইতস্তত করলো। সে কি আজ স্কার্ফ পরবে? সে যদি না পরে তাতে কি আসে যায়? সবাই নিশ্চয়ই হাসবে। হিজাব পরা শুরু করার পর সবাই তাকে নিয়ে যতটা মজা করেছে, এখন ছেড়ে দিলে তার চাইতে বেশি করবে। তার এটা সহ্য করার ক্ষমতা নেই।

সে খুশি যে ফারাজ স্ক্রুজের সাথে ঝামেলা মিটিয়ে ফেলেছে। কিন্তু তার নিজের সমস্যার কী হবে? সে এখনো কোন সমাধানে আসতে পারেনি।

ফারহানা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আয়নার উপর থেকে স্কার্ফ নামিয়ে আনলো। স্কার্ফ বাঁধার সময় সে সর্বোচ্চ চেষ্টা করলো নিজের মুখের দিকে না তাকাতে। আয়নায় যে মেয়েটাকে দেখা যাচ্ছে সে আমি না। সে ভাবলো, আমার মনের ভিতরটা দেখতে এমন না...।"

সে একবারও পিছনে না তাকিয়ে ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে গেলো।

ফারহানার মনে হলো আজকের দিন আর শেষ হবে না। সাজিয়া তার সাথে কথা চালিয়ে যাওয়ার অনেক চেষ্টা করলো। কিন্তু একটা সময় সেও হাল ছেড়ে দিলো। এমনকি তার অবস্থা দেখে রবিনাও আজ ঝামেলা বাঁধাতে এলো না। সে তার নতুন বান্ধবীদের সাথে গল্প করতে লাগলো।

ওরা সবাই ঈদ নিয়ে আলোচনা করছে। আর এক সপ্তাহ পরেই ঈদ। কে কোথায় যাবে। কী পরবে। কী উপহার পেতে পারে। কতো কী নিয়ে কথা বলার আছে।

ফারহানা এসব কিছু যেন শুনতেই পেলো না। সে নিজের চিন্তায় ডুবে আছে।

আমার জন্য রমজান তো অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে...।

স্কুলে ফারাজের মনে হলো তার পৃথিবী হঠাৎ করে সুন্দর হয়ে গেছে। এখানে আসার পথে সে ব্রুজের দেওয়া ফোন ফেলে দিয়ে এসেছে। তার কাছে নিজেকে অসম্ভব স্বাধীন মনে হচ্ছে। তার সামনে সম্ভাবনাময় এক জীবন পড়ে আছে।

সে অংক পরীক্ষায় যথেষ্ট ভালো নাম্বার পেলো। বিজ্ঞান ক্লাসে স্যার কী পড়ালেন খুব মনোযোগ দিয়ে শুনলো। আর সময়মত যোহরের নামাজ আদায় করলো।

নামাজ শেষ করে সে দেখলো আরো একজন এখনো নামাজের রুমে বসে আছে। সে মাথা ঘুরিয়ে একটা পরিচিত মুখ দেখতে পেলো। সে রমজানের শুরুতে তারাবীহ পড়তে গিয়ে মসজিদে এই ছেলেকে দেখেছে।

"আসসালামু আলাইকুম" ফারাজ বললো। নিজের বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণে সে নিজেই অবাক হয়ে গেছে।

"ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই" ছেলেটা হেসে জবাব দিলো। তার নতুন নতুন গোঁফ গজাচ্ছে। উজ্জ্বল একজোড়া চোখ। "অনেকদিন তোমাকে মসজিদে দেখি না। ব্যস্ত ছিলে নাকি?"

"হ্যাঁ" ফারাজ লজ্জা পেলো। তার ব্রুজের কথা মনে পড়ে গেলো। "আমি একটু ব্যস্ত ছিলাম। কিন্তু এখন সব কাজ শেষ হয়ে গেছে। ইনশাআল্লাহ্ নিয়মিত মসজিদে যাবো।"

"আর্ট রুমের দেওয়ালে টানানো আরবী ক্যালিওগ্রাফিটা তোমার আঁকা। তাই না?"

“হ্যাঁ আমিই এঁকেছি।” ফারাজ উত্তর দিলো, “তুমি কীভাবে জানো?”

“মি. ম্যাকারথি আমাদের ক্লাসে তোমার অনেক প্রশংসা করছিলেন। ওনাকে তো থামানোই যাচ্ছিলো না!”

ফারাজ হাসলো, “আরে ওটা তেমন কিছু না! তুমি কি আহমেদ আলীর নাম শুনেছো। [illegible] গ্রাফিতি আর্টিস্ট?”

“টাউন সেন্টারে যিনি গ্রাফিতি এঁকেছেন উনি? হ্যাঁ; আমার বোন ওনার অনেক বড় ভক্ত। সে তার কোন বান্ধবীর কাছ থেকে ওনার কথা শুনেছে। আমাকেও টেনে নিয়ে গিয়েছিলো ছবি আঁকা দেখতে। অনেক সুন্দর। তুমি তো চাইলে ওভাবে আঁকতে পারবে। তাই না?”

ফারাজ কিছুক্ষণ ভেবে বললো, “আমি চেষ্টা করতে পারি। আমি চাই এরকম সুন্দর, বিশাল কোন ছবি আঁকতে।”

এরপর ওরা দুজনেই চুপ করে নিজেদের মত চিন্তা করতে লাগলো। অদ্ভুতভাবে ওদের নিজেদের কাছে কতো পরিচিত মনে হচ্ছে। একটা সময় ক্লাসের ঘণ্টা পড়ে গেলো। “আচ্ছা এখন তাহলে আসি ভাই। ইনশাআল্লাহ্ আবার তোমাকে এখানে দেখাবো।”

“হ্যাঁ আবার দেখা হবে।” ওরা হাত মিলিয়ে ব্যাগ নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো।

“এই! তোমার নাম জানা হয়নি।”

“সামীর ” ছেলেটা হেসে জবাব দিলো, “তোমার নাম তো ফারাজ। তাই না?”

ফারাজ হেসে মাথা নাড়ালো।

“আবার দেখা হবে। ভালো থেকো...।”

তারপর ওরা আলাদা হয়ে গেলো।

মি. ম্যাকারথি স্কুল শেষ হওয়ার পরেও ছবি আঁকার জন্য ফারাজকে থেকে যেতে অনুমতি দিলেন। আবার ফারাজ নিজের জগতে ঢুকে গেছে। তার মাথার মধ্যে হাজারটা ছবি ঘুরপাক খাচ্ছে। সে রং তুলি দিয়ে তার একটা [illegible] ক্যানভাসে তুলে নিয়ে আসছে। যতক্ষণ না ছবি তার মনমত হচ্ছে সে একের পর এক রং ঢেলে যাচ্ছে। মি. ম্যাকারথি ক্লাসের পিছনে বসে গান

শুনতে শুনতে পরীক্ষার খাতা দেখছেন। মাঝে মাঝে তিনি ফারাজের দিকে তাকাচ্ছেন। ফারাজ আবার ছবি আঁকতে শুরু করেছে। এতে উনি খুবই খুশি। এভাবেই যেন চলতে থাকে।

ফারাজের জন্য বাইরের দুনিয়ার সবকিছু অদৃশ্য হয়ে গেছে। সে শুধু একবার আসরের নামাজের জন্য জায়গা ছেড়ে উঠলো। সে যখন উঠে দাঁড়িয়ে নিজের আঁকা ছবি দেখলো, তার মুখে হাসি ফুটে উঠলো। আর কিছুক্ষণ কাজ করলেই একটা সুন্দর ছবি পাওয়া যাবে।

"ঠিক আছে স্যার। আজকের মত আমার কাজ শেষ" সে তার শিক্ষকের দিকে তাকিয়ে বললো।

মি. ম্যাকারথি তার মোটা চশমার মধ্যে দিয়ে ফারাজের দিকে তাকালেন। "খুবই সুন্দর হয়েছে ফারাজ। খুবই সুন্দর...। বোঝা যাচ্ছে অনেক আবেগ দিয়ে আঁকা। আমার খুবই ইচ্ছা করছে পুরোপুরি শেষ হলে কেমন লাগবে দেখতে।"

"আমারও" ফারাজ নিজের জিনিসপত্র গোছাতে গোছাতে বললো। "কাল আবার দেখা হবে স্যার।"

"হ্যাঁ ফারাজ" তার শিক্ষক জবাব দিলেন, "কাল দেখা হবে।"

মি. ম্যাকারথি মুখে হাত দিয়ে গভীর মনোযোগে ফারাজের আঁকা ছবির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

তার মত একটা প্রতিভাবান ছেলে এই আস্তাকুঁড়ে কী করছে? তিনি ভাবলেন।

ফারাজ স্কুল থেকে বের হয়ে দেখলো প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সে তার মুখস্ত সূরা পড়তে পড়তে বাস স্ট্যান্ডের দিকে হেঁটে যেতে লাগলো।

আলহামদুলিল্লাহ্ আজকের দিন তার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর দিন। এমন একটা দিন যেদিন তাকে কোনকিছু নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হয়নি। একটু পরেই ইফতারের সময় হয়ে যাবে। সে বাড়ি ফিরে তার মা আর বোনের সাথে ইফতার করবে।

ফারহানা! সে মোবাইল খুঁজতে পকেটে হাত ঢুকালো। হঠাৎ করে তার ফারহানার সাথে কথা বলতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু ফারাজের পকেট খালি।

তার মনে পড়লো সে আজ সকালে মোবাইল ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে এসেছে। বাড়ি ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত ছিলো।
ফারাজ, ফারহানা আর নিজের সুন্দর দিনের চিন্তায় এতটা বিভোর ছিলো যে মাজ আর তার বন্ধুরা যে রাস্তার পাশে অপেক্ষা করছে সেটা দেখতে পায়নি। ওরা ওঁৎ পেতে আছে।

□

ফারহানা বাড়ি ফেরার পথে ঠিক করলো লাইব্রেরিতে যাবে। তাদের বাড়ির পাশের লাইব্রেরি না। বরং শহরের মধ্যে বড় শপিং মলের উপরে যে লাইব্রেরি সেখানে।
"আমি তোমার সাথে আসি?" সাজিয়া তাকে একা যেতে দিতে চাইলো না।
"না লাগবে না। আমি একাই পারবো" ফারহানা জবাব দিলো। "তাছাড়া এটাই ভালো হবে। তুমি তো জানো তোমার বাবা টাউন সেন্টারে ঘোরা পছন্দ করেন না।"
"হ্যাঁ আমি জানি। কিন্তু তবুও..।"
"কোন সমস্যা হবে না সাজিয়া। আমি লাইব্রেরীতে ঢুকে একটু পড়বো। হয়তো টুকটাক কিছু কিনতেও পারি। আমার আসলে একটু মাথা ঠাণ্ডা করা দরকার।"
"আচ্ছা, ঠিক আছে তাহলে। যদি কিছু দরকার হয় আমাকে কিন্তু ফোন করবে। ঠিক আছে?"
সাজিয়া ফারহানাকে জড়িয়ে ধরলো। তারপর দুইজন দুইদিকে চলে গেলো। ফারহানা বাসের জানালা দিয়ে পাশ ঘেঁষে আরেকটা বাসের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইলো। বাসের গায়ে এশিয়ান গার্ল ম্যাগাজিনের বিজ্ঞাপন। লম্বা, চিকন দুইটা সুন্দরী মেয়ে নতুন এশিয়ান ফ্যাশনের জামাকাপড় পরে দাঁড়িয়ে আছে। চোখে নীল লেন্স আর মেকাপের কারণে ওদের দেখতে এশিয়ানের চেয়ে বেশি ইংরেজই মনে হচ্ছে। বাসের গায়ে, বিলবোর্ডে, বাস স্টপে, ম্যাগাজিনের পাতায় ও দোকানের দেয়ালসহ সব জায়গায় শত শত মেয়ের ছবি। তারা সবাই সুন্দরী, আবেদনময়ী ও অসম্ভব

রকম নিখুঁত। ফারহানার মনে হলো ছবির মেয়েগুলো তাকে নিয়ে ঠাট্টা করছে। "কি? তুমিও আমাদের মত হতে চাও?"
কিছুদিন আগেও সবাই তাকে এই মডেল, নায়িকা, গায়িকার সাথে তুলনা করতো। আর এখন? সে সবকিছুর থেকে আলাদা হয়ে গেছে। তার বিশাল হিজাব চিৎকার করে সবাইকে জানিয়ে দিয়েছে সে আর এই মেয়েগুলোর সাথে প্রতিযোগিতায় নেই।
ফারহানার একটা অংশ এখনো প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা সেই মেয়ে হতে চায়। যাকে মালিক ভালোবেসে ছিলো।
কিন্তু এসব ভেবে কী হবে? সে কি ওই জীবনের সব কুৎসিত দিক দেখে তারপর একজন ভালো মুসলিম হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়নি?
সে কি মালিকের আসল রূপ দেখেনি?
এসব ভাবতে ভাবতে ফারহানা বাস থেকে নেমে লাইব্রেরিতে ঢুকলো। লাইব্রেরির কাছাকাছি গিয়ে সে উপরে তাকিয়ে দেখলো একটা শ্যামলা, ঝাঁকড়া চুলের এশিয়ান ছেলে আর স্কুল ড্রেস পরা চুল কালার করা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।
ওরা মালিক আর রবিনা ছিলো।

"ওই! ফারাজ!" মাজ শুনশান রাস্তায় হঠাৎ চিৎকার করে ডাক দিলো। ও আর ওর সাথীরা ফারাজের দিকে হেঁটে আসছে ধীরে ধীরে। সবার হাত পিছনের দিকে। ওরা ফারাজকে ঘিরে ধরলো।
ফারাজের বুক ধক করে উঠলো। গায়ের সব রক্ত যেন মাথায় উঠে গেলো। কান ঝা ঝা করছে। ছেলেগুলো অনেক বড়সড় দেখতে। দেখেই বোঝা যায় সবার হাতে অস্ত্র আছে। ফারাজ চাকু আর ব্যাটের কোণা দেখতে পাচ্ছে।
"তোমার আর আমার তো অনেক হিসাব বাকি আছে" মাজের গলা অদ্ভুত নিষ্ঠুর শোনাচ্ছে। "আজ তো স্ক্রুজ নেই তোমাকে বাঁচানোর জন্য বাবু সোনা! আজ তুমি টের পাবে বড়দের পিছনে লাগলে কী হয়।"

ফারাজ ওর চোখে হিংস্রতা দেখতে পেলো। আর ওর মুখের কাটা দাগটা যেন আরো বিশ্রি দেখাচ্ছে। ফারাজ কোনকিছু না ভেবে জীবন বাঁচানোর জন্য দৌড় দিলো।
"ধরো ওকে!" মাজ গর্জন করে উঠলো। আর সবাই মিলে ফারাজকে ধরার জন্য ছুটতে লাগলো।

ফারহানা স্তব্ধ হয়ে থেমে গেলো। তাহলে রবিনা সত্যি কথা বলেছিলো। ওর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চাইলো। বুকের মধ্যে ব্যথা করতে লাগলো। সে একটা বড় পিলারের পিছনে লুকিয়ে পড়লো। এত দিন মালিককে মনে করে কষ্ট পাওয়া, তার সাথে কথা বলতে চাওয়া ও তার কাছে ফিরে যাওয়ার আকুতি সব চোখের পানি হয়ে ঝরতে লাগলো।
তুমি একটা গাধা ফারহানা। রবিনা ঠিক বলেছে। তুমি একটা গাধা।
কিন্তু সে কৌতুহল থামাতে না পেরে পিলারের পেছন থেকে উঁকি দিয়ে দেখতে লাগলো। তার যেন মনে হলো কিছু একটা ঠিক নেই। মালিককে দেখে খুশি মনে হচ্ছে না। সে হাসছে না। এক হাতে স্কুল ব্যাগ ধরে রাখা। আর অন্যহাত নেড়ে কথা বলছে।
ফারহানা নিজেকে সামলাতে পারছে না। সে আস্তে আস্তে মানুষের মধ্যে মিশে গিয়ে মালিকের কাছাকাছি একটা পিলারের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালো। এখান থেকে সে মালিকের কথা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। কিন্তু মালিক কখনো এভাবে ফারহানার সাথে কথা বলেনি। মালিকের গলা কঠিন আর শীতল শোনাচ্ছে। এটা অন্য এক মালিক যাকে ফারহানা চেনে না।
"তো তুমি আমাকে এখানে কেন ডেকে এনেছো রবিনা?" সে বলছিলো। "আর তুমি মিথ্যা কেন বলেছো যে ফারহানা তোমার সাথে আছে?" তারপর সে সন্দেহের চোখে রবিনার দিকে তাকালো। মালিক জানতো রবিনা এই মিথ্যাটা কেন বলেছে।
"আমাকে আর কতবার বলতে হবে?" মালিকের কণ্ঠে রাগ, "তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক হওয়া সম্ভব না বুঝেছো? তুমি এইগুলো দয়া করে বন্ধ

করো। আমি বিরক্ত! আমার বন্ধুদের সবাইকে ফোন করে বিরক্ত করছো। আবার আমাকে মিথ্যা বলে এখানে ডেকে এনেছো। এসবের মানে কী? অসহ্য! আমি তোমাকে পছন্দ করি না। এটা মাথায় ঢুকিয়ে নাও।"
ফারহানা রবিনার চেহারা লাল হয়ে যেতে দেখলো। তার পরিচিত জেদী মুখ।
"মালিক তুমি কাকে বোকা বানাচ্ছো? আমি দেখেছি তুমি আমার দিকে কীভাবে তাকাও। আর তাছাড়া" রবিনা ভ্রূ উঁচু করলো, "তুমি জানো আমার পেছনে কত ছেলে ঘুরঘুর করে?"
"ভালো তো। কিন্তু আমি ওই ছেলেগুলোর দলে না" মালিক চলে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়ালো। কিন্তু রবিনা তাকে আটকে দিলো। সে পিছন থেকে ধমকের সুরে ডেকে বললো, "ফারহানার জন্য তুমি আমার সাথে এমন ব্যাবহার করছো তাই না? কারণ ও তোমাকে কষ্ট দিয়েছে তাই?"
মালিক ঘুরে দাঁড়ালো। রবিনা মাথা ঝাকিয়ে হেসে বললো, "বেচারা মালিক তুমি ভুল মেয়েকে ভালোবেসেছো। পাথর হৃদয়ের একজনকে ভালোবেসেছো। আমি যেদিন বলেছিলোম পার্টিতে তোমাকে আর অ্যাম্বারকে দেখেছি। সেদিন যদি তুমি ওর মুখ দেখতে...।"
মালিকের চোখ কুঁচকে গেলো, "আমি আর কে?"
"গল্পটা কিন্তু সুন্দর। তুমি পার্টিতে একটা মডেলের সাথে প্রেম করছিলে। যেখানে ফারহানার যাওয়ার অনুমতি নেই।"
"তুমি ইমতির পার্টির কথা বলছো? যেখানে তুমি আমার গায়ে পড়ার চেষ্টা করছিলে...।"
"আমি নিশ্চয়ই এই গল্প ফারহানাকে বলতে পারতাম না তাই না?"
রবিনার কথায় ধীরে ধীরে মালিকের রাগ বাড়তে লাগলো। সে রবিনার হাত ধরে দাঁতে দাঁত চেপে বললো, "তুমি ওকে এসব কেন বলেছো? হাহ্? যাতে আমাদের সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়?"
রবিনা মালিকের দিকে তাকিয়ে রইলো। তার চোখে আগুন জ্বলছে।
"ওহ মালিক বাস্তবে ফেরত আসো! ফারহানা কোনও দিন তোমাকে সুখী করতে পারবে না! তোমার ওকে দরকার নেই...।"

"তোমার মত ফালতু মেয়েকে আমার কোন দরকার নেই!" মালিক রবিনাকে একপাশে ঠেলে দিয়ে হাঁটতে লাগলো।
সে এতটা রেগে ছিলো যে সামনে তাকিয়ে থাকা হিজাব পরা মেয়েটাকে সে প্রথমে চিনতে পারলো না। কিন্তু সেই সবুজ চোখ আর কফির মত গায়ের রং, যাতে একটু ক্রিমের ছোঁয়া আছে। শুধু একটা অচেনা সাদা কাপড়ে মোড়ালেই কি অচেনা হয়ে যায়।
মালিক বিশ্বাস করতে পারছে না, সে আসলেই কাকে দেখছে।
"ফারহানা?"

ফারাজের জুতা ঘামে ভিজে গেছে। কিন্তু সে দৌড়ানো থামায়নি। তার পিছনে আরো ছয় জোড়া জুতা দৌড়ে আসছে। মুখে হুংকার।
শেষ বিকালের আকাশে মেঘ জড়ো হচ্ছে। সে কোনভাবে যদি অন্ধকার হয়ে যাওয়ার আগে এই রাস্তা পার হয়ে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের রাস্তায় উঠতে পারে, তাহলেই হয়তো বেঁচে যাবে। সে দৌড়াতে গিয়ে একজন বৃদ্ধা মহিলাকে ধাক্কা দিয়ে চলে গেলো। মহিলার সাথে ছোট ছোট কয়েকটা স্কুল ড্রেস পরা বাচ্চা। বাচ্চাগুলো হাতে চকলেট নিয়ে দৌড়ে যাওয়া ছেলেগুলোর দিকে হা করে তাকিয়ে রইলো। আর তখনই ফারাজ রাস্তার অন্যপাশে পরিচিত একটা মুখ দেখতে পেলো। সাজিয়া! কিন্তু ফারাজ থামতে পারলো না। সে দৌড়াতে দৌড়াতে একসময় সাজিয়াকে পেছনে ফেলে সামনে চলে গেলো।
অনেকদিন সে এতক্ষণ এত জোরে দৌড়ায়নি। আর ও আজ সারাদিন রোজা। তার শরীরের সব শক্তি নি:শেষ হয়ে যাচ্ছে। সে পিছনে ফিরে মাজ আর তার সঙ্গীদের দেখলো। যেভাবেই হোক এদের হাত থেকে পালাতে হবে। পাশে একটা গলি দেখে ফারাজ সেখানে ঢুকে গেলো। গলির মধ্যে পুরনো গাড়ি আর নানা রকম ভাঙাচোরা জিনিস রাখা। পিছনে ফারাজ মাজের লোকেদের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে। কিন্তু ফারাজ একটা অন্ধ গলিতে

ঢুকে পড়েছে। তার সামনে শুধু দেয়াল। বড় বড় দেয়াল। এত উঁচু যে সে টপকে পার হতে পারবে না। পালানোর সব রাস্তা বন্ধ।
মাথা ঘুরাতেই মাজ ঘুষি দিয়ে তাকে ফেলে দিলো। ফারাজের সারা দেহে ব্যথা ছড়িয়ে পড়ছে। সে জানতেও পারছে না কখন তাকে কি দিয়ে কোথায় কোথায় মারা হচ্ছে। প্রথমে সে আটকানোর চেষ্টা করলো। কিন্তু একটা সময় শুধু দুই হাত দিয়ে মাথা ধরে রাখা ছাড়া তার আর কিছুই করার রইলো না। ফারাজ মাটিতে পড়ে আছে। আর তার উপর একের পর এক কিল ঘুষি, ব্যাট ও বুট দিয়ে আঘাতের পর আঘাত করে যাওয়া হচ্ছে।
একটা সময় ফারাজ আবছাভাবে মাজের গলা শুনতে পেলো, "থামো" আর সবাই থেমে গেলো।
ফারাজ তার নিজের রক্ত আর ঘামের মধ্যে মাটিতে পড়ে আছে।
মাজ হাঁটু গেড়ে ফারাজের ঘাড়ের উপর উঠে বসলো। যন্ত্রণায় ফারাজ চিৎকার করে উঠলো। মাজ হেসে ফারাজের মুখ চেপে ধরলো।
"সুন্দর ছেলে"সে ফিসফিস করে বললো, "এখন তুমি দেখবে আমি কেমন ছবি আঁকি" মাজ তার পকেট থেকে কিছু একটা বের করলো।
ল্যাম্পপোস্টের আলোয় ফারাজ চাকুর ধারালো অংশ দেখতে পেলো। সে তার চোখ বন্ধ করে ফেললো।
হে আল্লাহ! আমাকে সাহায্য করো!
মাজ তার চোখের নিচ থেকে ধারালো চাকু দিয়ে মুখে দাগ কাটতে শুরু করলো। ফারাজের প্রতিটি শিরায় ব্যথা পৌঁছে যাচ্ছে।
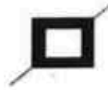
ফারহানা যখন মালিকের চোখের দিকে তাকালো, তার মনে হলো পুরো পৃথিবী সিনেমার মত ধীরে চলতে শুরু করেছে। মালিক একটু দূরেই দাঁড়িয়ে আছে। ফারহানা তার চোখের ভাষা পড়তে পারছে। মালিকের চোখে না বুঝতে পারা, অবাক হয়ে যাওয়া এক দৃষ্টি।

সে ধীরে ফারহানার দিকে এগিয়ে আসলো। তার চোখ কোন উত্তর খুঁজছে। "ফারহানা?" তার গলা সম্পূর্ণ অন্যরকম। সব সময় শোনা সেই আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠস্বর আর নেই।
"হ্যাঁ মালিক!" ফারহানা শান্তভাবে বললো, "এটা আমিই।"
মালিকের চোখ ফারহানার সাদা স্কার্ফ ও লম্বা স্কার্ট খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে।
"কি...?" সে যেন কথা খুঁজে পাচ্ছে না, "তুমি কোথায় ছিলে? আমার ফোন ধরোনি কেন? তোমার কি হয়েছে?"
সে পিছনে তাকিয়ে রবিনার তাচ্ছিল্য ভরা হাসি দেখলো।
"দেখেছো তুমি কিসের পিছনে ছুটছো মালিক?" রবিনা বললো, "তোমার জন্য আর কিছুই নেই...।"
"রবিনা! এখান থেকে যাও" মালিক ধমক দিয়ে বললো।
উারহানা দেখলো রবিনার মুখ থেকে বিজয়ের হাসি মিলিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তারপরও সে জোর করে হাসার ভান করে ফারহানার দিকে তাকালো।
"ছেলেটা তো দেখছি তোমার জন্য পাগল! আচ্ছা যাও। তুমি জিতে গেছো...।"
"রবিনা! একদম চুপ করে থাকো!" ফারহানা তার এক সময়ের বান্ধবীর দিকে চোখ রাঙালো। "এখানে কেউ জেতেনি। তুমি বুঝেছো? আমরা সবাই হেরে গেছি। সবাই...। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে তুমি সেটা এখনো দেখতে পাচ্ছো না। সত্যি বলতে তোমার জন্য আমার মায়া হয়। তুমি তোমার বোনের মত হতে গিয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছো। আমরা তোমাকে যেসব কারণে পছন্দ করতাম সব হারিয়ে গেছে। এখনো সময় আছে নিজেকে বোঝো। জীবনে আসলেই কী চাও সেটার জন্য কাজ কাজ করো।"
"তোমার মত একজনের কাছ থেকে আমি পরামর্শ নিতে চাচ্ছি না!" রবিনা বললো, "নিজেকে তুমি কী মনে করো?"
"আমি তোমার বান্ধবী ছিলাম। এখনো আছি রবিনা। আর তাই অন্যরা তোমাকে যে কথা বলবে না, সেটা বলার সাহস আমার আছে। খুব বেশি

দেরি হয়ে যাওয়ার আগে আমার কথা শোন। না হলে একটা সময় তোমার চারপাশে শুধু হতাশা আর নকল চাটুকার ছাড়া কেউ থাকবে না।"
ফারাহানা রবিনার চোখে কষ্ট দেখতে পেলো। কিন্তু রবিনা ঝটকা মেরে চুল সরিয়ে ফারহানার সামনে দিয়ে চলে গেলো।
ফারহানা তার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইলো। সে জানে রবিনা অনেক অহংকারী, কিন্তু বোকা না। সে এক সময় হয়তো বুঝতে পারবে...।
"ফারহানা...?" ফারহানা মালিকের দিকে তাকালো। মালিকের দিকে ফেরার সময় ফারাহানার স্কার্ফের ভিতর থেকে এক গোছা চুল বেরিয়ে এলো। মালিক হাত বাড়িয়ে চুলগুলো সরিয়ে দিলো। ফারহানা চোখ বন্ধ করে ফেলেছে। কিন্তু বুঝতে পারছে মালিকের হাত তার মুখ ছুঁয়ে গেছে।
ফারহানা জানে সে যদি চায় তাহলে এক্ষণি মালিক তার হতে পারে। তাকে শুধু একবার "হ্যাঁ" বলতে হবে। সে মনে মনে হ্যাঁ বললেও মুখ দিয়ে অন্য কথা বেরিয়ে এলো।
"না মালিক!" সে বললো, "আমার পক্ষে সম্ভব না।"
মালিকের মন খারাপ হয়ে গেলো। "তুমি কি রবিনার জন্য একথা বলছো?" সে জিজ্ঞাসা করলো। "ও যা বলেছে তার একটা কথাও সত্যি না! আমি তোমাকে ভালোবাসি। শুধুই তোমাকে ভালোবাসি...।"
ফারহানার কষ্ট হতে লাগলো।
এ কি পরীক্ষায় ফেললে!
কিন্তু সে ঢোক গিলে গভীরভাবে নিশ্বাস নিয়ে বললো, "আমি দুঃখিত মালিক। রবিনা যখন আমাকে বলেছিলো তোমাকে অন্য একটা মেয়ের সাথে দেখেছে। আমার মাথা নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। আমি জানতাম তোমার সাথে বা অন্য কারো সাথেই সম্পর্কে জড়ানো আমার উচিত হয়নি। কিন্তু ওর কথা শুনে বুঝতে পেরে ছিলোম, আমি কত বড় ভুল করেছি। এইসব কিছু কতটা ভুল...।"
"কিন্তু আমি সে কারণে স্কার্ফ পরছি না। আমি স্কার্ফ পরছি নিজের জন্য। এই রমজান আমাকে অনেককিছু নিয়ে ভাবতে বাধ্য করেছে। আমি ঠিক

করেছি শুধু নামেই না; কাজেও আমি নিজেকে প্রকৃতরূপে একজন ভালো মুসলিম হিসাবে গড়ে তুলবো। আমি জানি এখন আমার কথা বুঝতে তোমার কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু হয়তো একদিন তুমি বুঝবে...।"

কিন্তু মালিক ফারহানার কথা মেনে নিতে পারছে না। ফারহানা মালিকের চোখে কষ্ট মাখা রাগ দেখে ভয় পেলো। "তুমি ঠিকই বলেছো। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি তোমাকে ভালোবাসি! এখানে ভুল কোথায়?"

ফারহানা অন্যদিকে তাকিয়ে মুখ লুকালো।

"ফারহানা! আমার দিকে তাকাও! তুমি আমাকে ভুল ভাবছো। আমি কোন খারাপ ছেলে নই। তোমাকে আমি যে কথাগুলো বলেছি, যা লিখেছি; এই কথা আমি আর কোন মেয়েকে বলিনি বা লিখিনি। কোনদিন না! মানুষ বলাবলি করে, আমার পিছনে অনেক মেয়ে ঘুরে। আমিও নিশ্চয়ই তার সুযোগ নেই। কিন্তু ওই মানুষগুলো আমাকে চেনে না। তারা জানে না এসব বিষয়ে আমার কোন আগ্রহ নেই। তুমি আমাকে চেনো। রবিনার মত একটা মেয়ের কথা তুমি কীভাবে বিশ্বাস করলে...?"

"মালিক! তুমি আমার কাছ থেকে কী শুনতে চাও?" ফারহানা এখন উঁচু গলায় কথা বলছে, "তুমি তো সব নিয়ম জানো। তুমি জানো না আমাদের ধর্ম অনুযায়ী ছেলে মেয়ে দেখা করাও নিষেধ! তো এখন কী চাও? আমাকে বিয়ে করবে? তোমার সাথে পালিয়ে যেতে বলছো? তুমি দেখতে পাচ্ছো না? আমাদের সামনে আর রাস্তা নেই। সব শেষ...?"

"না ফারহানা!" মালিক জবাব দিলো, "সব শেষ হয়ে যায়নি। আমরা চাইলে একটা উপায় বের করতে পারি। আমি চেষ্টা করবো।"

"আমরা কীভাবে সব ঠিক করবো মালিক?" ফারহানা করুণ স্বরে বললো।

"আমার দিকে তাকাও। আমি এতটা দূর পর্যন্ত এসেছি। নামাজ পড়ছি। হিজাব পরছি। একজন ভালো মুসলিম হওয়ার চেষ্টা করছি। আর এভাবেই আমি শান্তি পাচ্ছি। আমাদের জীবন এখন আলাদা, মালিক। আমরা দুজনে জীবন থেকে ভিন্ন জিনিস চাই। তুমি সেটা জানো...।"

মালিক কোন কথা না বলে শুধু শুনলো। যখন সে আবার কথা বলা শুরু করলো তার কণ্ঠস্বর আবেগে গাঢ় হয়ে গেছে, "আমি তোমার চিন্তা ভাবনা বদলে দিবো। আমি তোমাকে ভালোবাসি। আর আমার কিছু আসে যায় না যে তুমি ঠিক নাকি ভুল।"

তার গলা ধরে আসলে সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলো।

"কিন্তু আমি জানি তুমি ঠিক বলছো। তুমি ঠিক কাজটাই করছো। তুমি যতোটা ইসলাম সম্পর্কে জানো আমিও জানি। আর আমি তোমাকেও চিনি। একবার যদি তুমি ঠিক করে ফেলো কিছু করবে, তাহলে তোমাকে কেউ ফেরাতে পারবে না।"

যখন সে মাথা উঁচু করে আবার ফারহানার দিকে তাকালো, তার চোখে পানি আর সম্মান।

"তুমি সবসময় শক্ত মনের ছিলে ফারহানা। এতে কোন সন্দেহ নেই। এই জন্যই তুমি সবার চাইতে আলাদা...।"

তারপর মালিক চোখ বন্ধ করে অন্যদিকে ফিরে বললো, "আমার চলে যাওয়া উচিত...।

"না!" ফারহানার হৃদয় কেঁদে উঠলো। কিন্তু সে ঠোঁটে দাঁত চেপে নিজেকে সর্বশক্তি দিয়ে মালিককে ডাকা থেকে আটকে রাখলো।

বিসমিল্লাহ্। এটাই সঠিক রাস্তা।

"মালিক!" ফারহানা অবশেষে ডাকলো, "আসসালামু আলাইকুম।"

"ওয়ালাইকুম আসসালাম" সে শেষ একবার মুখ ঘুরিয়ে জবাব দিয়ে মানুষের ভিড়ে মিশে গেলো।

ফারহানা শপিংমল থেকে যখন রাস্তায় বেরিয়ে এলো, বাতাস তার চোখের পানি উড়িয়ে নিয়ে গেলো। এগুলো বৃষ্টির পানিও হতে পারে। আকাশ থেকে ছোট ছোট বৃষ্টির কণা নেমে আসছে।

গাড়ির দুলুনিতে ফারাজের ঘুম এসে গেলো। ফারাজ বিশ্বাস করতে পারছে না যে সে বাড়ি ফিরছে। তাও আবার সাজিয়া আর ইমরানের সাথে এক

গাড়িতে। তার স্বপ্নে দেখা রাজকন্যার সাথে। ফারাজ গত আধাঘণ্টা তার সাথে যা ঘটে গেছে সেগুলো ভাবলো।

যখন মাজ তার মুখে ছুরি দিয়ে কেটে দিচ্ছিলো, তখনই সে গলির মাথায় একটা গম্ভীর আর জোরালো কণ্ঠস্বর শুনতে পায়।

"ওই! ওখানে কী হচ্ছে?"

তিনজন পুলিশ আর একজন কমিউনিটি অফিসার দাঁড়িয়ে ছিলেন। আর তাদের সাথে একটা সুন্দর, কালো স্কার্ফ পরা মেয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছিলো। সে সাজিয়া।

পুলিশের লোককে দৌড়ে আসতে দেখে মাজ আর তার লোকেরা তেলাপোকার মত এদিক ওদিকে দৌড়ানো শুরু করলো। কয়েকজন দেয়াল টপকে পালালো। দুইজন পুলিশ তাদের পিছনে ধাওয়া করলো।

ফারাজ কমিউনিটি অফিসারের মুখ দেখার চেষ্টা করলো। কিছুক্ষণ পর সে বুঝতে পারলো লোকটা ইমরান ছিলো। মুসলিম ইউথ অর্গানাইজেশনের পরিচালক ইমরান।

"ফারাজ?" ইমরান বিশ্বাস করতে পারছে না, "কী হয়েছে ভাই? তোমার এই অবস্থা কে করেছে?"

কিন্তু ফারাজ শুধু তার মাথা নাড়ালো। সে এই বিষয়ে কথা বলতে চায় না।

"সাজিয়া এখানে কেন?" সে কোনমতে জিজ্ঞাসা করলো।

"এই ছোট্ট মেয়েটা অনেক সাহসের পরিচয় দিয়েছে"একজন অফিসার বললেন। "এই মেয়েটাই আমাদের খুঁজে বের করে এই ঘটনার কথা বলেছে। ও না থাকলে তোমার আরো বাজে অবস্থা হতো...।"

"সাজিয়া?" ফারাজ সাজিয়ার দিকে তাকিয়ে আস্তে করে বললো। "তুমি আমার জীবন বাঁচিয়েছো?"

"না গাধা" সাজিয়া কোমল স্বরে বললো, "শুধু তোমার মুখ বাঁচিয়েছি...।"

প্রচণ্ড ব্যথার মধ্যেও ফারাজের মন খুশিতে নেঁচে উঠলো। সে বাড়ি যেতে চায়। কিন্তু পুলিশের লোকেরা তার কাছ থেকে ঘটনার বিবরণ না শুনে তাকে ছাড়েননি।

ফারাজ ঠিকমত কোন জবাব দেয়নি। সে শুধু বলেছে "আমি জানি না। আমি জানি না ওরা কারা ছিলো।"
অবশেষে পুলিশ সাজিয়া আর ফারাজকে বাড়ি পৌছে দিতে বলেছে ইমরানকে । ইমরান পুলিশের সাথে কমিউনিটির নিরাপত্তার জন্য কাজ করে।
"ওরা দুজনেই আমার এলাকায় থাকে।" ইমরান বলেছিলো।
ফারাজ আর সাজিয়া গাড়িতে কোন কথা বললো না। পরিস্থিতি শান্ত হয়ে যাওয়ার পর তারা দুজনেই লজ্জা পাচ্ছে। ইমরান আজকালকার যুবকদের নিয়ে নিজের মনেই কথা বলে যাচ্ছে।
ফারাজ কিছু মনোযোগ দিয়ে শুনছে না। ওরা প্রথমে সাজিয়াকে তার বাড়িতে নামিয়ে দিলো। ইমরান আগে দৌড়ে গিয়ে সাজিয়ার বাড়ির লোককে বোঝালো সে কেনো তাদের মেয়েকে বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছে। সাজিয়া দরজায় দাঁড়িয়ে তাদের বিদায় জানালো।
"আসসালামু আলাইকুম ফারাজ!" সে শান্ত স্বরে বললো। "আল্লাহ্র কাছে শুকরিয়া যে তুমি ঠিক আছো। অনেক অনেক শুকরিয়া।"
ফারাজ হাসতে গিয়ে আবার কুঁকড়ে গেলো। তার মাথায় এখনো ব্যথা করছে।
ওরা যখন গাড়ি নিয়ে রাস্তায় নামলো, ফারাজ ইমরানকে বললো তাকে বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে নামিয়ে দিতে।
"আমি তোমার বাবা মায়ের সাথে কথা বলতে চাই ফারাজ!" ইমরান কঠিন গলায় বললো।
"এখন ওনারা কেউ বাড়িতে নেই" ফারাজ ইতস্তত করে বললো।
ইমরান তার দিকে কঠিন চোখে তাকালো। "আমি যতো ছেলেকে চিনি ফারাজ।" সে বললো, "তাদের মধ্যে আমি কোনদিন ভাবিনি তুমি এইসবের মধ্যে জড়াবে। আমি মিথ্যা কথা বলবো না। এটাতে আমি খুবই মর্মাহত ভাই। তুমি ওই গবেটগুলোকে কেন বাঁচাতে চাইছো? হাহ্? মেকি সম্মান রক্ষার জন্য?"
ফারাজের মনে পড়লো স্কুজ যেভাবে বলে, রাস্তার ইজ্জত।
কিন্তু ইমরান থামলো না। "এইসব কারণে কত ছেলের জীবন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ফারাজ। তোমার জীবনে আরো অনেক কিছু করার আছে!" সে

অন্যদিকে তাকিয়ে গাড়ির লক খুলে দিলো। "আমি কাল বাসায় এসে তোমার বাবা মায়ের সাথে কথা বলবো। তুমি বাড়ি গিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হও। কালকে পুলিশ তোমার সাথে আবার কথা বলতে চাইবে। আমি আশা করি তুমি কাল হয়তো বুদ্ধিমানের মত আচরণ করবে।"

আর তারপর সে চলে গেলো। ফারাজ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করলো।

ফারাজ যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলো তখন রাস্তার অন্যপাশে ফারহানা বাস থেকে নামছিলো। বৃষ্টি আর চোখের পানি মিলেমিশে তার দৃষ্টি ঝাপসা করে দিয়েছে।

নিজেকে সামলাও ফারহানা। সে ভাবলো। যা হওয়ার হয়ে গেছে...। কোন আফসোস রাখা যাবে না। বিসমিল্লাহ্...।

বাস স্টপের পাশেই একটা ডেলিভারি ভ্যান রাখা ছিলো। ফারহানা সেটার পিছনে দাঁড়িয়ে ভালোভাবে নিশ্বাস নিয়ে রাস্তার অন্যপাশে তাকালো। পরিচিত একজন মানুষেকে দেখে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

"ফারাজ!" সে ডেকে উঠলো। ভাইকে দেখে তার কান্না আরো বেড়ে গেছে।

ফারহানা তার ভাইয়ের কাঁধে মাথা রেখে কাঁদতে চায়। সে চায় ফারাজ তাকে বলুক সে যা করেছে ঠিক করেছে। বলুক সব ঠিক হয়ে যাবে। ফারহানা দৌড়ে রাস্তা পার হতে চাইলো। সে রাস্তার পাশে দাঁড় করানো গাড়ি দেখতে পেলো না।

□

ফারহানা রাস্তার মাঝমাঝি আসতেই একটা গাড়ির আলো জ্বলে উঠলো। বৃষ্টি ভেজা রাস্তায় গাড়িটা অনেক জোরে ফারহানার দিকে এগিয়ে আসছে। ফারাজ মুহূর্তের মধ্যে চালকের আসনে বসা মুখটা দেখতে পেলো। ব্রুজ সরাসরি তার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। তারপর ফারাজের চোখের সামনে সবকিছু মন্থর হয়ে গেলো। ফারাজ যেন চোখের সামনে যা হচ্ছে তার সবটা একটু একটু করে দেখতে পেলো।

ফারহানার ব্যাগ হাঁটার তালে তালে ওর পায়ের সাথে বাড়ি খাচ্ছে। স্ক্রুজ তার দিকে শয়তানি দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ওর মুখ হালকা খুলে গেলো। ফারাজের মনে হলো তার পুরো দেহটা যেন গিলে খাওয়া হচ্ছে।
গাড়ির সাথে ধাক্কা খেয়ে ফারহানা বৃষ্টি ভেজা রাস্তায় ছিটকে পড়ে গেলো। চিৎকারে চারিদিকের বাতাস ভরে উঠলো।
গাড়িটা চাকায় শব্দ তুলে দূরে চলে গেলো। দূরে, অনেক দূরে।
ফারাজ তার বোনের দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া দেহটার দিকে তাকিয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে লাগলো।
ফারাজের মধ্যে আগুন জ্বলে উঠলো। সে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে চিৎকার করে উঠলো, "না আ আ আ আ আ আ!"
আশেপাশের ঘর থেকে মানুষ বেরিয়ে এলো। কিছুক্ষণের মধ্যে রাস্তা ভরে গেল সাইরেন, মানুষ আর কান্নায়।
না আল্লাহ, না। এটা হতে পারে না...। কিছুতেই হতে পারে না।
"আমরা তার কাছ থেকে এসেছি এবং একদিন তার কাছেই ফিরে যাবো।"

ঊনবিংশ অধ্যায়
পুনরুদ্ধার

ফারহানা বেঁচে আছে কিন্তু কোনও মতে। ফারাজ একবারও তার বোনের কাছ থেকে সরেনি। সে কারো কোন প্রশ্নের জবাব না দিয়ে নিজের সারা গায়ে আঘাতের চিহ্ন, ফোলা মুখ, আর চোখের নিচের কাটা দাগ নিয়েই ফারহানার সাথে এম্বুলেন্সে উঠে গেলো। ফারহানার হাসপাতালে ভর্তি হওয়া, রক্ত দেওয়া, নানা রকম টেস্ট করানো পুরোটা সময় ফারাজ তার সাথে সাথে থাকলো। তার বাবা মা তাকে বার বার শান্ত হতে বললো। কিছু খাওয়ার জন্য জোর করতে লাগলো। কিন্তু কিছুই যেন ফারাজের মাথায় ঢুকছে না। নিজের রক্ত মাখা শরীর আর মুখের দিকে তাকিয়ে অপরাধবোধে ফারাজের মরে যেতে ইচ্ছা করছে।

সব দোষ আমার। যদি আমি স্ক্রুজের পাল্লায় না পড়তাম। যদি মাজের সাথে না লাগতে যেতাম। যদি আরো আগে এসব থেকে বের হয়ে আসতাম, তাহলে আজ এসব হতো না...।

অবশেষে সে একটা শর্তে নিজের চিকিৎসা করাতে রাজি হয়েছে । আর শর্তটা হচ্ছে তাকে সারারাত ফারহানার সাথে থাকতে দেওয়া হবে।

আম্মাজি মেয়ের হাত ধরে কাঁদছেন। তিনি একবার ছেলের দিকে, আরেকবার মেয়ের দিকে তাকাচ্ছেন। যেন কাউকে চিনতে পারছেন না।

"কী হয়েছে ফারাজ? তোমার আর তোমার বোনের এই অবস্থা কে করেছে?" তিনি কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞাসা করলেন।

ফারাজ তার মায়ের দিকে তাকিয়ে ভাবলো। তার জীবনের চাইতে মায়ের জীবন কতো আলাদা। তিনি কল্পনাও করতে পারবেন না। তার আর ফারহানার সাথে কী কী ঘটে গেছে। এসব আসলে কার দোষ? ফারাজ জানে না। সে শুধু জানে, যা হয়েছে ঠিক হয়নি। এভাবে চলতে পারে না। কষ্ট হলেও তাকে কিছু সত্যি কথা বলতে হবে। কিন্তু এখন না। এখন তাকে শক্ত হতে হবে। মা সবসময় যেমন সন্তান হিসাবে দেখতে চান তাকে তেমন হতে হবে।

"ইসসস আম্মাজি" ফারাজ মায়ের পিঠে হাত রেখে সান্ত্বনা দিলো। "আমরা এসব নিয়ে কাল সকালে কথা বলবো। ঠিক আছে?"
একসময় আম্মাজি ফারহানার বিছানার একপাশে ঘুমিয়ে পড়লেন। ফারাজ মায়ের গায়ের উপর একটা চাদর দিয়ে দিলো। সেই রাতে ফারাজের মনে হলো, সে আর ফারহানা এক সাথে নিশ্বাস নিচ্ছে। যদি ফারহানার হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে সেও মারা যাবে। সারারাত ফারাজ ফারহানার সাথে কথা বলে, আর চোখের পানি ফেলে কাটালো। সে একটা কথাই শুধু বারবার বলেছে,"আমি দুঃখিত। আমি দুঃখিত।"
পরের দিন ভিজিটিং আওয়ার শুরু হওয়ার সাথে সাথে নাজমা ফুফু হাসপাতালে আসলেন। নাজমা তার ভাবিকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ কাঁদলেন। আগের সপ্তাহের সব মনোমালিন্য দূর হয়ে গেছে। এখন তারা আবার একটা পরিবার। তারপর ফুফু ফারাজের মুখে হাত বুলালেন। তার চোখে রাজ্যের প্রশ্ন।
ফারাজ মাথা নাড়িয়ে তার ফুফুকে জড়িয়ে ধরলো।
"আমি এখানে যতক্ষণ প্রয়োজন হয় থাকবো ভাবি" তিনি ফারাজের মাকে বললেন। আম্মাজি সায় দিলেন।

□

পরদিন সকালে তারা সবাই ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করতে বসলেন। "ফারহানা এখন আশঙ্কামুক্ত" ফারহানার ডাক্তার বললেন, "ওর হাত ভেঙে গেছে। আর পায়ে কয়েক জায়গায় হাড় ফেটে গেছে। ওর ভাগ্য ভালো যে স্কুল ব্যাগ মাথার নিচে চলে এসেছিলো। না হলে মাথায় অনেক জোরে আঘাত লাগতো। হয়তো ব্রেইন ড্যামেজ হয়ে যেতো।"
ফারাজ আর তার বাবা আম্মাজিকে ধরে বসে আছে। তিনি মাথা নিচু করে বললেন, "ব্রেইন ড্যামেজ?"
"এখনো পর্যন্ত ওর চিকিৎসা ভালোভাবেই চলছে। আশা করা যায় কোন সমস্যা হবে না। নিশ্চিন্ত থাকুন। আমরা আমাদের সাধ্যমত কাজ করছি।"

"ধন্যবাদ ডাক্তার সাহেব!" ফারাজের বাবা ডাক্তারের সাথে হাত মিলিয়ে বললেন।
ডাক্তার ফারাজের দিকে তাকিয়ে একটু হালকা কাশি দিয়ে বললেন, "আমরা পুলিশের সাথেও কথা বলেছি। সন্দেহ করা হচ্ছে এটা পরিকল্পিত ঘটনা। কেউ আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলো। হয়তো আপনার ছেলে এ ব্যাপারে কিছু জানতে পারে।"
আম্মাজি আঁতকে উঠে প্রথমে ছেলের দিকে, তারপর ডাক্তারের দিকে তাকালেন।
"আমার ছেলে?" তিনি সন্দেহের গলায় বললেন, "আপনি নিশ্চয়ই ফারাজের কথা বলছেন না। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি ও এসবের কিছুই জানে না।
ডাক্তার ভ্রূ কুঁচকে বললেন, "বিকালে পুলিশ আসবে আর তারা ফারাজের সাথে কথা বলতে চান। আমার মতে পুলিশের আগে আপনারা একবার ছেলের সাথে কথা বলুন" এ কথা বলে তিনি রুম ছেড়ে চলে গেলেন।
ফারাজের মা রেগে গেছেন। তিনি স্বামীর দিকে ফিরে বললেন, "তুমি কি শুনেছো মাহমুদ? ফারহানার সাথে যা হয়েছে তার জন্য ওরা ফারাজকে সন্দেহ করছে!"
"আমি জানি না। হয়তো কোন ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। তুমি তো জানোই পুলিশরা এশিয়ান ছেলেদের সাথে কেমন আচরণ করে...।"
"ভাই! ভাবী!" নাজমা ফুফু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমি ফারহানার কাছে যাচ্ছি। দেখে আসি ওর এখন কী অবস্থা। আপনারা ঠাণ্ডা মাথায় কথা বলুন। তিনি চলে যাওয়ার আগে ফারাজের দিকে তাকালেন। তার চোখের দৃষ্টি স্বাভাবিক। ফারাজ বড় করে নিশ্বাস নিলো। যথেষ্ট হয়েছে।
"আম্মাজি! বাবা! আমার আপনাদের কিছু বলার আছে...।"
আর তারপর প্রথমে হড়বড় করে। পরে ধীরে সুস্থে ফারাজ তার বাবা মায়ের কাছে স্ক্রুজ, তার দল, মাজ, মারামারি, অ্যাকসিডেন্ট এর ব্যাপারে সব সত্যি কথা বলতে শুরু করলো। ওরা অনেকক্ষণ ঐ রুমে বসে

রইলো। প্রথমে প্রশ্ন, তারপর ঝগড়া; আর শেষে কান্না দিয়ে তাদের আলোচনা শেষ হলো।

"আমি ভাবতাম আমার সন্তানদের আমি চিনি মাহমুদ!" আম্মাজি কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "কিন্তু আমি ভুল ছিলাম। আমি কত ভুল ছিলাম।"

"আমরা দুজনেই ভুল" বাবা এক হাত মায়ের কাঁধে, আর এক হাত ফারাজের কাঁধে রেখে বললেন।

ফারাজ তার বাবার দিকে তাকালো। সারাজীবন সে এই মানুষটাকে খুশি করার চেষ্টা করেছে। আর আজ প্রথমবার সে তার বাবার চোখে হতাশা নয় ভালোবাসা দেখলো।

"বাবা!" সে ফিসফিস করে বললো। আর একটা সময় মনের অজান্তেই তারা তিনজন একে অপরকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো।

রুম থেকে বেরিয়ে তাদের কয়েকজন পুলিশের সাথে দেখা হলো। তারা ফারাজের সাথে কথা বলতে চান। আগের রাতে ইমরানের বলা কথাগুলো ফারাজের মনে পড়লো। সে যা জানতো সব পুলিশের কাছে বললো।

পুলিশ সব লিখে নিয়ে ফারাজকে ধন্যবাদ দিলেন। "এই ধরনের লোকের ব্যাপারে তথ্য পেতে আমাদের অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়" একজন অফিসার বললেন। "তুমি অনেক সাহসের একটা কাজ করেছো। এই ছেলেগুলো জঘন্য সব কাজ করেছে। আর আমরা তার জন্য এদের শাস্তির ব্যবস্থা করবো।"

যখন ওরা ফারহানার কাছে ফিরে গেলো, ফারাজ নাজমা ফুফুকে যা যা হয়েছে সব বললো। তিনি ফারাজের কাঁধে হাত রাখলেন। "আমি জানতাম তুমি ঠিক রাস্তায় ফিরে আসবে। মাশাআল্লাহ্" তিনি কোমল স্বরে বললেন, "আমি জানতাম তুমি ঠিক কাজটাই করবে।"

ফারহানার বিছানার পাশে বসে ফারাজ রমজানের প্রথম রাতের কথা ভাবতে লাগলো। তারা দুজনে নামাজের পরও জেগে ছিলো। একসাথে কুরআন পড়েছে। সব কথার বাইরেও তাদের যে আত্মার সম্পর্ক আছে তা আরো গাঢ় হয়ে উঠেছে।

সে ঐসব অনুভূতির কথা ভাবলো। কীভাবে মুহূর্তের মধ্যে সব চোখের সামনে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। নিজের মত খুশি না থেকে অন্যদের মত হতে গিয়ে। অন্যদের কথা মত আল্লাহ্‌র পথ থেকে সরে গিয়ে। সে সব ধ্বংস করে দিয়েছে।

কিন্তু এটাই তো ইমানের পরীক্ষা তাই না? সব সময় ভালোর জন্য চেষ্টা করে যাওয়া আর কখনো হার না মানা। তোমাকে দমিয়ে দেওয়ার জন্য লোভ লালসা আসবে। জীবনে ভয় আসবে। ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। তোমাকে শুধু অবিচল থেকে লড়াই করে যেতে হবে।

□
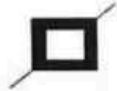
ফারাজ পুরো এক সপ্তাহ স্কুলে গেলো না। ফারহানা যখন শেষ রমজানে ফজরের সময় চোখ খুললে,া তখনো ফারাজ তার পাশে নামাজের পাটিতে বসা। ফারাজ জায়নামাজ থেকে লাফ দিয়ে উঠে গিয়ে ফারহানার হাত ধরলো। তার চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলো তার বোন তাকে চিনতে পেরেছে কি না।

ফারহানা যখন অচেনা দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো ফারাজের বুক কেঁপে উঠলো। সে ভেবেছিলো তার বোন তাকে ভুলে গেছে। কিন্তু একটু পরেই ফারহানার মুখে হাসি ফুটে উঠলো। সে ফারাজের হাতে চাপ দিলো।

"আসসালামু আলাইকুম পিচ্চি ভাই আমার!" ফারহানা মৃদু স্বরে বললো, "তোমাকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে।"

খুশিতে ফারাজের মুখ দিয়ে কথা বের হচ্ছে না।

"তোমাকেও খুব সুন্দর দেখাচ্ছে না বুঝেছো" সে হাসলো। তারপর তার হাসি মিলিয়ে গেলো, "তুমি ভালো হয়ে যাবে বোন। সব ঠিক হয়ে যাবে।"সে বিড়বিড় করে বললো।

"আমি মা-বাবাকে সব বলে দিয়েছি। এখন থেকে সব অন্যরকম হবে।"

ফারহানা হেসে মাথা নাড়লো। তার চোখ দিয়ে পানি পড়ছে "ইনশাআল্লাহ্‌...।" সে ফিসফিসিয়ে বললো।

“আমি গিয়ে ওনাদের ডেকে নিয়ে আসছি ঠিক আছে?” ফারাজ চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে আবার থেমে গেলো, “ওহ্ সাজিয়া কালকে তোমাকে দেখতে এসেছিলো। এই চিঠিটা দিয়ে গেছে। বলেনি কার চিঠি। কিন্তু তোমার জ্ঞান ফেরার সাথে সাথে দিতে বলেছে।”

ফারাজ ফারহানার হাতে সাদা খামে ভরা একটা চিঠি দিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে গেলো।

চিঠির খাম খুলতে ফারহানার বেশ কষ্ট হলো। কিন্তু তারপরই পরিচিত হাতের লেখা দেখে সে থেমে গেলো। সাবধানে খামের ভিতর থেকে একটা কার্ড বের করে আনলো। কার্ডের উপর মাত্র কয়েক লাইন লেখা–

“ফারহানা! তুমি কি ভেবেছো আমি এত সহজে তোমাকে ভুলে যাবো? তুমি নিশ্চয়ই আমাকে অনেক বড় বোকা ভাবছো। আমার জন্য অপেক্ষা করিও। আমি নিজেকে বদলে তোমার কাছে ফিরে আসবো। এই জীবনে একবার তোমার মত মানুষ আমার জীবনে এসেছে। আমি তোমাকে হারাতে পারবো না। ইনশাআল্লাহ্।”

“মা...

পরিবারের সবাই যখন ফারহানাকে দেখতে রুমে ঢুকলো তার মুখ তখন জ্বলজ্বল করছে। আর বাইরে ওঠা নতুন সূর্যের আলোয় জ্বলে উঠছে রাস্তার অপর পাশের বিশাল দেয়ালে আঁকা গ্রাফিতি। ওখানে লেখা আছে শুকরান (কৃতজ্ঞতা)।

রমজানের শেষ দিনে, ঈদের ঠিক আগের দিন ফারাজ, ফারহানা আর তাদের বাবা-মা বুঝতে পারলো তারা আল্লাহর কাছে কতোটা কৃতজ্ঞ। আর সেই সাথে তাদের নতুন জীবনের যাত্রা শুরু হলো।

ফারহানা হিজাবের দিকে হাত বাড়ালো। তার মাথার মধ্যে ঝড় বয়ে যাচ্ছে। ক্লাসের সব মেয়ে তার দিকে হয়তো অদ্ভুত চোখে তাকাবে, রাস্তার লোকজন হাসাহাসি করবে। আর মালিক? সেই বা কি বলবে? ফারহানা কি পারবে মালিক কে ছেড়ে আসতে?

ফারাজ স্ক্রুজ আর তার দলের কথা ভাবছে। স্কুলের সবাই এখন ফারাজকে ভয় পেয়ে চলে। কিন্তু তার মূল্য কি ফারাজকে দিতে হচ্ছে না? স্ক্রুজের কণ্ঠস্বর ফারাজের কানে বেজে ওঠে, এই যায়গা সবাই পায় না বন্ধু, যোগ্যতা লাগে। এইতো আমার আর কয়েকটা ছোটোখাটো কাজ করে দাও তাহলেই...

যমজ ভাইবোন ফারাজ আর ফারহানা মাত্র ছয় মিনিটের ছোটো বড়ো। তাদের দুজনের জীবনেই ঝড় আসতে চলেছে। তারা কি পারবে একসাথে এই বিপদের মোকাবিলা করতে? একসাথে হাত ধরে সঠিক পথে এগিয়ে যাওয়ার সাহস কি তাদের হবে ? নাকি তারা একে অন্যকে ঠেলে দেবে ধ্বংসের দিকে?